ভুবন সোম

B3643

"বনফুল"

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট · কলিকাতা – ৬

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট হইতে
শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
পৌষ ১৩৬৩

দাম দুই টাকা

৩৬৪৩
STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA
২০.১.৬০

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

ভুবন সোম

ভূমিকা

'ভুবন সোম' ১৩৬৩ সালের শারদীয়া 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তক প্রকাশ করবার সময় সামান্য কিছু অদলবদল করেছি। 'সচিত্র ভারতে' প্রকাশিত হওয়ার পরই যে সব পাঠকপাঠিকা পত্রযোগে বইখানির প্রশংসা করেছিলেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভাগলপুর
২৩-১২-৫৬

"বনফুল"

উৎসর্গ

অনুজ শ্রীমান নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কল্যাণবরেষু

ভাগলপুর
২৫-১১-৫৬

অনিল অনেক আগে থেকে এসেই জাহাজঘাটে পৌঁছেছিল। সোজা মাঠ থেকে এসেছিল সে মাঠামাঠি হেঁটে। তার কাপড়ে অসংখ্য চোর-কাঁটা, পা দুটি ধূলিধূসরিত। সে এসে দেখলে, ঘাট-গাড়ি তখনও আসে নি, স্টীমারও বেশ 'লেট' আসছে। গঙ্গার ধারে গিয়ে পূর্বদিগন্তে দৃষ্টি-নিবদ্ধ ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। না, জাহাজের কোনও চিহ্নই নেই, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। তবু সে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ উড়ন্ত হাঁসের সারি দেখতে পেয়েছিল সে। রাজহাঁসের সারি, ইংরেজিতে যার নাম 'বার হেডেড্ গুজ', এ দেশের শিকারীরা যাকে বলে 'গীজ'। লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অনিল। মনে পড়ল গত বছর একসঙ্গে গোটা তিনেক রাজহাঁস মেরেছিল সে। হঠাৎ ফড়িংকে মনে পড়ল। সে-ও সঙ্গে ছিল। রোগা-রোগা চেহারা, লাল-ডোরা-কাটা কামিজ গায়ে, বড় বড় হলদে দাঁত, কটা চুল, কটা চোখ। অর্ধেকের উপর মাংস সে একাই খেয়েছিল। খুব খেতে পারত। অনিল তাকে আবার আসতে বলেছিল, কিন্তু সে আর আসে নি, আসবেও না। মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছে বেচারা মাত্র মাস ছয়েক আগে। বেশ মনখোলা লোক ছিল ফড়িং, কোনও কথা গোপন রাখতে পারত না। এমন কি সে যে একবার চুরি করেছিল সে গল্পও করেছিল তার কাছে। ফড়িংয়ের কথা মনে পড়াতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অনিল।

'অনিলবাবু যে, কি খবর, কতক্ষণ এসেছেন ?'

রেলের টিকিট-কলেক্টার সখীচাঁদ এসে কখন পিছনে দাঁড়িয়েছিল অনিল তা টের পায় নি।

'এই মাত্র এসেছি। ভুবনকাকা এই ষ্টীমারে আসছেন। তাঁকে নিতে এসেছি। ষ্টীমার তো খুব 'লেট' দেখছি আজ—'

'হ্যাঁ, খুব লেট। আপনার কাকা আছেন না কি? জানতাম না তো। কোথা থেকে আসছেন তিনি ?'

'সাহেবগঞ্জ থেকে। ভুবন সোম, আমার আপন কাকা নন—কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বহু কালের। নিজের কাকার চেয়েও বেশী আপন উনি।'

'ভুবন সোম মানে ? এ. টি. এস. ভুবন সোম ?'

'হ্যাঁ।'

এ শুনে সখীচাঁদের চোখ-মুখ-নাক-ভুরু-থুতনি সব কুঁচকে গেল একসঙ্গে, এবং তা গেল ব'লে একটু অপ্রস্তুতও হয়ে পড়ল সে। অনিলবাবুর কাছে এ ভাবটা প্রকাশ না হ'লেই যেন ভাল হ'ত। কিন্তু সামলে নিলে সে পর-মুহূর্তে

'মিস্টার সোম যে আপনার কাকা, তা জানতুম না।'

অনিল হেসে বললে, 'খুব কড়া অফিসার, নয় ?'

'খুব। বাপের কুপুত্তুর যাকে বলে। নিজের ছেলের চাকরিটিই খেয়ে দিয়েছে। জানেন নিশ্চয়ই।'

মৃদু হেসে অনিল মাথা নাড়ল—'জানি।'

'এখানে আসছেন কেন ?'

'পাখী শিকার করতে।'

'খুব ভাল শিকারী বুঝি।'

'শখ আছে খুব। তবে প্রায়ই মারতে পারেন না।'

'পাখীরা তো আর রেলের চাকর নয়!'

একটা তিক্ত হাসি হেসে এগিয়ে গেল সখীচাঁদ। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'গঙ্গার ধারে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, তার চেয়ে চলুন আমার বাসায়। স্টীমারের এখনও অনেক দেরি। ততক্ষণ বরং একদান দাবায় বসা যাক, চলুন।'

'তাই চলুন। বউ এসেছে?'

'আরে না মশাই। আমাদের সমাজে 'গওনা'র অনেক ঝন্ঝট্।'

খাঁটি বাঙালী হ'লে ঝঞ্ঝাট বলত। সখীচাঁদ যদিও চমৎকার বাংলা বলতে পারে, কিন্তু জাতে সে বিহারী গোয়ালা। সেই জন্যেই 'দ্বিরাগমন' না ব'লে 'গওনা' বললে। সম্প্রতি 'যাদব' উপাধি ধারণ ক'রে ওদের জাতভাইরা অনেকে আত্মমর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করছে, লেখাপড়াও শিখছে অনেকে। সখীচাঁদের কথাবার্তা শুনে ওকে বিহারী ব'লে মনেই হয় না। ঘাট থেকে মাত্র সাত-আট মাইল দূরে এক গ্রামে ওর শ্বশুরবাড়ি। ভেবেছিল, এখানে যখন বদলি হয়ে এসেছে তখন এইখানেই বউকে নিয়ে আসবে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির মুরুব্বীরা 'ঝন্ঝট্' লাগিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে নাকি শুভদিন নেই। তার উপর ওই ভুবন সোম তার নামে রিপোর্ট করেছে। দোষ তার ছিল অবশ্য, কিন্তু আজকাল ঘুষ কে না নিচ্ছে! উপরি-পাওনা পেলে কে ছাড়ে! ওই যে মোটা কালো মালবাবুটি, ঘুষ নিয়ে নিয়ে লাল হয়ে গেল। সে তো মাত্র দু-চার টাকা কামিয়েছিল। সাহেব অফিসার হ'লে একটু ধমক দিয়ে ছেড়ে দিত। কিন্তু সোম সাহেব (বাঙালী সাহেব কিনা) লম্বা রিপোর্ট করেছেন নাকি। সখীচাঁদ আপিসে খবর নিয়েছিল, আপিসে এখনও রিপোর্ট পৌঁছয় নি, হয়তো পাঠায় নি এখনও, কিন্তু পাঠাবে ঠিক। লোকটা 'নম্‌রি' বদমাশ।

বাঙালীরা যাকে 'একের নম্বর বদমাইশ' বলে, বিহারীরা তাকে বলে 'নম্‌রি বদমাশ'। ভুবন সোমের সঙ্গে অনিলবাবুর আত্মীয়তা আছে শুনে সখীচাঁদের একটু আশা হ'ল, যদি—

'আচ্ছা, মাসখানেক আগে যখন সোম সাহেব এখানে এসেছিলেন তখন তো আপনার কাছে যান নি ?'

'না। তখন ছুটি ছিল না বোধ হয়। এখন ছুটি নিয়ে আসছেন শিকার করবার জন্যে।'

'আপনাদের বাড়িতেই থাকবেন ?'

'আর কোথা যাবেন এখানে! সহজে অবশ্য উনি কারও বাড়িতে উঠতে চান না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওঁর আলাদা সম্পর্ক। বাবাকে দাদা বলতেন, আর ঠিক দাদার মতই শ্রদ্ধা করতেন। আমাকেও নিজের ছেলের মতই ভালবাসেন।'

সখীচাঁদের আশা-প্রদীপের শিখা আর একটু উজ্জ্বল হ'ল। একটু ইতস্তত ক'রে সে বললে, 'বড্ড কড়া অফিসার কিন্তু উনি, এটা বদনাম স্থনাম যা-ই বলুন। দেখুন না সামান্য একটা কারণে আমার নামে রিপোর্ট করেছেন শুনলাম। পট্ ক'রে চাকরিটা যদি চ'লে যায়, মহা মুশকিলে প'ড়ে যাব এ বাজারে। বাজারটা কি রকম দেখছেন, আমার এই পোস্টের জন্যে বি. এ., এম. এ. পর্যন্ত দরখাস্ত করেছিল। আচ্ছা, আপনি যদি একটু—'

ইতস্তত ক'রে থেমে গেল সখীচাঁদ। কিন্তু অনিলের বুঝতে অসুবিধা হ'ল না।

'ও বাবা, সে আমি পারব না। আর তাতে উলটো ফল হবার সম্ভাবনা। সুপারিশ করলে উনি ভয়ানক চ'টে যান।'

'ও, তাই নাকি ?'

সখীচাঁদ মনে মনে কিন্তু বললে, 'খচ্চড়!'

নীরবে কিছুক্ষণ হেঁটে অবশেষে সখীচাঁদের কোয়ার্টারে পৌঁছল তারা। খড়ের ছাউনি, দরমার ঘর। ছোট একটু বারান্দা আছে। তাতে রোদও এসে পড়েছিল একফালি।

'রোদেই বসা যাক, কি বলেন! কাল থেকে বেশ শীত পড়েছে।'

'হ্যাঁ, রোদেই ভাল।'

বারান্দার এক ধারে হাল্‌কা ছোট একটা কাঠের টেবিল ছিল। সেইটেকে টেনে সখীচাঁদ রোদে নিয়ে এল, তারপর ঘরে ঢুকে বার করলে ছুটো টিনের চেয়ার। তারপর আবার ঘরে ঢুকে গেল। খট খট ক'রে শব্দ হতে লাগল একটা।

'অনিলবাবু, একবার ভিতরে আসুন তো!'

অনিল ভিতরে ঢুকে দেখল, সখীচাঁদ একটা টেবিলের ড্রয়ার ধ'রে টানাটানি করছে।

'জাম হয়ে গেছে ড্রয়ারটা, দেখুন তো খুলতে পারেন কি না! আপনার গায়ে তো খুব জোর শুনেছি। সর্বন্‌ বঢ়ইকে দিয়ে বানিয়েছিলাম, কড়া মজুরি নিয়েছে, বললে—আস্‌লি টিক, কিন্তু কাণ্ড দেখুন। এ ড্রয়ার কি আমার ওয়াইফ খুলতে পারবে?'

'ড্রয়ার খুলে কি হবে এখন? চলুন দাবায় বসা যাক।'

'আরে মশাই, ড্রয়ারের ভিতরেই যে দাবার গুটিগুলো রয়েছে।'

'ও!'

অনিল একবার টেনে দেখলে, সত্যিই বেশ আঁট।

'বেশ এঁটে গেছে। কাঁচা আমকাঠ দিয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ করুন, আপনি টেবিলটাকে খুব শক্ত ক'রে ধ'রে থাকুন, আমি খুব জোরে টানব, টেবিলটা যেন স'রে না আসে।'

'দাঁড়ান, তা হ'লে টেবিলটাকে সরিয়ে নিই একটু। দেওয়ালে ঠেস দিলে একটু সাপোর্ট পাব।'

তাই করা হ'ল। অনিল বলিষ্ঠ ব্যক্তি। একটানে খুলে ফেললে ড্রয়ারটা। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল। দেওয়ালের উপর টেবিলের ঠিক সামনেই বাঁধানো ফোটো টাঙানো ছিল একটা। সখীচাঁদের মাথা লেগে মেঝেয় প'ড়ে চুরমার হয়ে গেল তার কাচখানা।

'ও-হো-হো-হো, এ কি করলাম?'

আর্তনাদ ক'রে উঠল বেচারা।

'মাথায় লাগল না কি?'

অনিল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

'না, মাথায় লাগে নি।'—তারপর মুচকি হেসে বললে, 'বুকে লেগেছে। কার ছবি জানেন এটা? দেখুন।'

অনিলের হাতে ছবিটা দিলে সে। একটি হাস্যমুখী কিশোরীর ফোটো। নীচে নামও লেখা আছে, ইংরেজিতে কিন্তু—মিসেস বৈদেহী যাদব।

মুচকি হেসে সখীচাঁদ বললে, 'আমার বউ। মাইনর স্কুলে পড়ে।'

'আপনার মত বাংলা বলতে পারে?'

'আমার চেয়েও ভাল। ওদের মামার বাড়ি যে পাকুড়, সবাই বাংলা বলে সেখানে।'

'ফোটো তুললে কে?'

সখীচাঁদ মুচকি হেসে উত্তর দিলে, 'আমার শালা। তার শ্বশুর তাকে খুব দামী ক্যামেরা দিয়েছে একটা। খুব ছবি তুলে বেড়াচ্ছে, আমারও ছবি একখানা তুলে নিয়ে গেছে। দিন ওটা,

আজই সাহেবগঞ্জে পাঠাতে হবে ঘোষালের হাতে, বাঁধিয়ে আনবে আবার। আনতেই হবে।'

সখীচাঁদ ছবিখানি খবরের কাগজে পরিপাটী ক'রে মুড়ে একটি সরু দড়ি দিয়ে ভাল ক'রে বাঁধলে, তারপর ট্রাঙ্কের ভিতর রেখে দিলে সেটি।

'আসুন এইবার, বসা যাক একদান।'

ছুজনে বাইরে গিয়ে টেবিলে দাবার ছক পেতে বসল।

॥ ছুই ॥

পরিধানে-সাহেবী-পোশাক, মুখে-পাইপ ভুবন সোম জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে একটা ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আত্মনিমগ্ন হয়ে নিজের কথাই চিন্তা করছিলেন। যখনই তিনি একা থাকেন তখনই তিনি আর বর্তমানে থাকতে পারেন না, অতীতে ফিরে যান। অতীত জীবনেরই পর্যালোচনা করছিলেন তিনি মনে মনে।

সোম সাহেবের আসল বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু শরীর তত অপটু হয় নি। মাথার সামনের দিকের চুল ঈষৎ পাতলা হয়ে এসেছে, জুলফির চুলেও পাক ধরেছে ছু-একটায়, চোয়ালের দাঁতও ছু-একটা তুলিয়েছেন, কিন্তু শরীর বেশ মজবুত আছে। আপিসের খাতায় তাঁর বয়স চুয়ান্ন। তাঁকে তার চেয়েও কম দেখায়। বছর খানেক পরেই রিটায়ার করতে হবে তাঁকে। রিটায়ার করবার পরও অনেকে চাকরিতে 'এক্স্টেনশন' পেয়েছেন, কিংবা নূতন চাকরিতে বাহাল হয়েছেন, কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে সে সবের আশা নেই। তাঁর সার্ভিস রেকর্ড খুব ভাল, তবু আশা নেই। কারণ তিনি খোশামোদ করতে পারেন না, আজকালকার উপরওয়ালারা কেউ তাঁর উপর সন্তুষ্ট নন। সারাটা জীবন তিনি যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, কিন্তু অন্যায়ভাবে কারও কাছে মাথা নোয়ান নি কখনও। সাহেবেরা তাঁর কদর করত, তাই সামান্য কেরানীর পদ থেকে আজ তিনি এ. টি. এস. হতে পেরেছেন। এদের আমল হ'লে পারতেন না। এরা প্রথমেই খোঁজ করত লোকটার কি জাত, হরিজন কি না, তারপর খোঁজ করত সত্যাগ্রহ ক'রে জেল হয়েছিল কি না! যোগ্যতার প্রশ্ন সবশেষে। প্রথম তিনটে ভালভাবে মিললে যোগ্যতা না থাকলেও চলে। মিনিস্টারদের

কারও সঙ্গে যদি আত্মীয়তা থাকে, তা হ'লে তো কথাই নেই। ভুবন সোমের এসব সুবিধা ছিল না, তাই চাকরির মেয়াদ যে বাড়বে না তা তিনি জানতেন। এও তিনি জানতেন যে, পূর্বজন্মে সম্ভবত কোনও গুরুতর পাপ করেছিলেন, তাই এ দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে এত শাস্তিভোগ ক'রে গেলেন। তাঁর মাঝে মাঝে মনে হ'ত, এর চেয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে জন্মালে বোধ হয় বেশী সুখী হতাম। শুধু চাকরি-জীবনেই নয়, সামাজিক জীবনেও তিনি ক্রমাগত মার খেয়েছেন। কেউ তাঁর মুখের দিকে চায় নি। নিজের বাবা মা ভাই বোন ছেলে মেয়ে আত্মীয় বন্ধু—কেউ না। তাঁর বয়স যখন ষোল তখনই তাঁর ঘাড়ে প্রকাণ্ড সংসার এবং প্রচুর ঋণের বোঝা চাপিয়ে তাঁর বাবা সজ্ঞানে হরিনাম করতে করতে মারা গেলেন, সম্ভবত স্বর্গেই গেলেন। সে সব দিনের কথা মনে করলে এখনও ভয় হয় ভুবন সোমের। বাড়িতে একটি পয়সা নেই, বাজারে কেউ ধার দিতে চায় না। সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন সেদিন। সূর্য ওঠে কি না, উঠলেও তার থেকে আলো বেরোয় কি না—এ খবর রাখবারও সময় পান নি তখন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দু হাত তুলে নমস্কার করলেন ভুবন সোম। নমস্কারটা পিতৃবন্ধু যোগেন হাজরার উদ্দেশে। যখনই তাঁর কথা মনে পড়ে নমস্কার করেন। লোকটি তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিলেন বটে, কিন্তু সাঁচ্চা লোক ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর ওই লোকটিই এসে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন নিঃস্বার্থভাবে। ডি. টি. এস. আপিসে চাকরি করতেন, স্বয়ং ডি. টি. এস. এর নেকনজর ছিল তাঁর উপর। তিনিই ব'লে-ক'য়ে ভুবন সোমের চাকরিটি ক'রে দেন। তাঁর নিজের ছেলে তখন এণ্ট্রান্স পাস করেছে, কিন্তু তিনি তাকে না ঢুকিয়ে ভুবন সোমকেই ঢুকিয়ে দিলেন চাকরিতে। আজকাল হ'লে অবশ্য পারতেন না।

আজকাল ভদ্রসন্তানদের কিছু হবার উপায় নেই, মুচি-মেথর হাড়ি-ডোম হ'লে তো কথাই নেই, নিদেন পক্ষে নাপিত বা গোয়ালাও হতে হবে। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের ছেলে হওয়াটা আজকাল অপরাধের মধ্যে গণ্য। স্বাধীনতা পেয়ে কি চতুর্ভুজই হয়েছি আমরা! চারিদিক চোরে ভ'রে গেছে। দু-চারজন ছাড়া আজকাল ট্রেনে টিকিট কিনে চড়ে না কেউ। টিকিট-কলেক্টার আর গার্ডে মিলে সড় করে দু-চার পয়সা ক'রে নিয়ে দলকে দল প্যাসেঞ্জার পার ক'রে দিচ্ছে। বড় বড় গাঁটও চ'লে যাচ্ছে ব্রেকভ্যানে বিনা পয়সায়। হাতে-নাতে ধ'রে উপরে রিপোর্ট করলেও ফল হয় না, মিনিস্টারের আত্মীয়ের আত্মীয় তস্য আত্মীয় হ'লেও ছাড়া পেয়ে যায়। স্বাধীনতা মানে ছোটলোকদের স্বাধীনতা, ভদ্রলোকদের বিপদ।...

ভুবন সোম পাইপটাতে টান দিলেন। ধোঁয়াটাকে মুখের ভিতর পুরে ব'সে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর আস্তে আস্তে ছাড়লেন সেটা। আবার অতীত-জীবনের হিসাব-নিকাশে মন দিলেন পা দোলাতে দোলাতে। সারা জীবনটাই লড়াই করতে করতে কেটেছে তাঁর। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর কেবল একটি বিষয়েই একাগ্র লক্ষ্য ছিল, পান থেকে চুন খসছে কি না! ভুবন সোম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন যাতে না খসে, তবু তাঁকে খুশী করতে পারেন নি। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কর্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব সাধ আহ্লাদ শেষ হয়ে গেছে, এখন বেঁচে থাকা মানে দিনগত পাপক্ষয় করা। তাঁর সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল মেয়েদের ভাল ক'রে বিয়ে দিতে পারেন নি। কর্তা থাকলে নাকি ওই পেঁচামুখী হাড়-হারামজাদা মেয়ে দুটি রাজার বাড়িতে পড়ত। চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি ভুবন সোম। দুটি

বোনের বিয়ে দিতে পাঁচটি হাজার টাকা ধার করতে হয়েছিল তাঁকে। তা ছাড়া মায়ের সব গয়নাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু তবু ওই বিরিঞ্চিলাল আর জগন্নাথ ছাড়া অন্য কোন পাত্র জুটল না, জোটাতে পারা গেল না। এ দেশে বিরিঞ্চিলাল আর জগন্নাথের চেয়েও খারাপ পাত্র ঢের আছে, তারাও বিয়ে-থা ক'রে ঘরসংসার পেতে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই বাস করছে। কিন্তু তাঁর গুণবতী বোন দুটি তা পারলে না। শ্বশুরবাড়ি গেলই না, বললে—পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারব না। মা-ও তাদের কথায় সায় দিলেন। পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়া, পচা পুকুর, সাপ—কত কি আছে, সেখানে কি থাকা যায়! কিছুতেই গেল না। ফলে, ভগ্নীপতি দুটি কিছুদিন পরে ঘাড়ে এসে চড়ল। আর চ'ড়েই রইল। ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ভার ভুবন সোমকেই নিতে হয়েছে। বহু জায়গায় ব'লে-ক'য়ে বিরিঞ্চি আর জগন্নাথের চাকরিও তিনি ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা আলাদা বাসা করে নি, মা-ই করতে দেন নি। যখন চাকরি হ'ল তখনও তারা ভুবন সোমকে একটি পয়সাও সাহায্য করত না। অথচ গোপনে গোপনে এসেন্স কিনে আনত, রাবড়ি কিনে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত। ভাবটা, ভুবন সোম যেন তাদের পালন করতে বাধ্য। বংশবৃদ্ধিও মন্দ করে নি। দুই ভগ্নীর চোদ্দটি ছেলে মেয়ে হয়েছিল। এরা ভুবন সোমের সংসারকে তছনছ করেছে। শখ ক'রে বাগান করেছিলেন। একটি ফুল গাছে থাকতে দেয় নি, বাড়িতে সুস্থির হয়ে ঘুমুতে পর্যন্ত দেয় নি, দিনরাত চেঁচামেচি কান্নাকাটি। শেষটা চুরি করতে আরম্ভ করল। পকেট থেকে পয়সা চুরি অনেক আগে থেকেই করত, একদিন বড় বউয়ের গয়না পর্যন্ত চুরি গেল। কিন্তু তাদের ভাল ক'রে শাসন করবার উপায় ছিল না মায়ের জন্যে। মা তাদের আগলে আগলে বেড়াতেন,

তাদের জন্যে অনর্গল মিথ্যে কথা বলতেন। ওই রাবণের গুষ্টিকে খাওয়াতে হ'ত ব'লে ভুবন সোম নিজে কখনও ভাল জিনিস খান নি। চুনো মাছও সব দিন জোটে নি। সাধারণ ডাল ভাত তরকারি খেয়েই জীবনটা কেটেছে। ভাল ডালও জোটে নি। দিনের পর দিন লম্বা কলাইয়ের ডাল, মাঝে মাঝে ফ্যান মিশিয়ে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, অন্য ডাল আর ভালই লাগে না। হজমও হয় না। সেদিন একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন হয়েছিল—চপ কাটলেট দোলমা ডেভিল কত রকম কি ছিল, তাঁর ভালই লাগল না। উচ্ছে-ভাজা, বেগুনভাজা, পটলভাজা থাকলে খেতেন হয়তো। দুধ পর্যন্ত খেতে পান নি প্রথম জীবনে। বাড়িতে গাই ছিল একটা, সের দুই দুধ হ'ত; কিন্তু তাঁর ভাগ্যে এক ফোঁটা জোটে নি। মা আফিং খেতেন, তাঁর জন্য ঘন ক'রে জাল দেওয়া হ'ত খানিকটা, আর বাকিটা জল মিশিয়ে ছোট ছেলেগুলো খেত। তিন-চারটে ছোট ছেলে সর্বদাই থাকত সংসারে। তাদের বঞ্চিত ক'রে দুধ খাওয়ার কথা ভাবতেও পারেন নি তিনি। তিনি ভাবতে পারেন নি, কিন্তু শরীর সহ্য করবে কেন? একদিন আপিস থেকে ফেরবার সময় মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলেন। চন্দর ডাক্তার এলেন। বললেন—ব্লাড-প্রেসার খুব কম, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া দরকার। মাছ মাংস ডিম দুধের লম্বা ফর্দ দিয়ে গেলেন একটা। মা অবশ্য বলেছিলেন, শরীরের জন্যে যখন দরকার তখন ধার ক'রেও ওসব খেতে হবে। কিন্তু ভুবন সোম জানতেন, মা ধার শোধ করবেন না, করতে হবে তাঁকেই। এমনিই তো জিভ বেরিয়ে পড়েছে। দিন দুই পরে ভুবন সোম ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন—ডাক্তারবাবু, ওসব স্পেশাল খাবার আমি একা সকলের সামনে ব'সে খেতে পারব না। সবাইকে খাওয়াবার সামর্থ্যও আমার নেই, আপনি বরং আমাকে কোনও

পেটেণ্ট টনিক দিন। চন্দর ডাক্তার সাধারণত রোগীর মন জুগিয়ে চলতেন। কেউ যদি বলত—ডাক্তারবাবু, অম্বল খাব? খেও। ডায়াবিটিস-রোগী পেড়াপেড়ি করলে চিনি খাবার অনুমতিও পেত তাঁর কাছে। একটি বিষয়ে খুব কড়া ছিলেন কিন্তু। মিথ্যে সার্টিফিকেটটি কখনও লিখতেন না। পাকা-গোঁফ পাকা-ভুরু সদাপ্রসন্ন-মুখ চন্দর ডাক্তারের চেহারাটা ভেসে উঠল ভুবন সোমের মনে। তিনি কি একটা বিলিতি পেটেণ্ট টনিক লিখে দিয়েছিলেন তাঁকে, নাম মনে নেই এখন। শিশিতে পোরা চিকেন্‌স্ এক্‌স্ট্র্যাক্ট, পুরনো পোর্ট আর কডলিভার অয়েলও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিনতে গিয়ে জিভ বেরিয়ে পড়েছিল ভুবন সোমের। দ্বিতীয় বার আর কেনেন নি।

…উঠে পড়লেন ঈজিচেয়ার থেকে। হু-হু ক'রে কনকনে হাওয়া দিচ্ছে একটা। হাত-ব্যাগ থেকে মংকি-ক্যাপটা বার ক'রে পরলেন। বেশ শীত পড়েছে। মংকি-ক্যাপটা প'রে আরাম পেলেন। তাঁর বড় পুত্রবধূ এইটি বুনে পাঠিয়েছে তাঁকে সম্প্রতি। মেয়েটি এসব শৌখিন কাজে খুব দড়; কিন্তু বড়ি দিতে পারে না, আচার করতে পারে না, ওসব কিনে খায়। রাঁধা ডাল-ভাতও বাজার থেকে কিনে খেতে পারলে বাঁচে ওরা। কলকাতায় নাকি পাইস হোটেল হয়েছে। 'উঃ, উচ্ছন্নের পথে কি রকম সাঁ-সাঁ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে দেশটা, কি ছিল আর দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল!' —আপন মনেই কথা ক'য়ে উঠলেন ভুবন সোম। তারপর চাইলেন গঙ্গার চরের দিকে। দু পাশেই গঙ্গার চর। অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কই, পাখী তো দেখা যাচ্ছে না একটাও! অথচ অনিল লিখেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসেছে। কই?

'চেয়ারটা একটু সরিয়ে দেব সার্ ওদিকে? এখানটা বড্ড হাওয়া।'

ঘাড়ের পাশেই কথা শুনে চমকে উঠলেন ভুবন সোম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, জাহাজের টি. টি. সি. কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'দরকার হ'লে আমি নিজেই সরিয়ে নেব। তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি নিজের কাজ কর গে যাও।'

ছোকরাটি অপ্রস্তুত হয়ে চ'লে যাচ্ছিল।

'শোন।'

ফিরে এল আবার।

'কি নাম তোমার?'

'বিকাশেন্দু গুপ্ত।'

'একটা ভুল ধারণা নিশ্চিহ্ন ক'রে মন থেকে মুছে ফেল তোমরা। খোশামোদ ক'রে আমাকে কখনও খুশী করতে পারবে না। নেভার। আমি ওল্ড্ স্কুলের লোক, ডিউটি ফার্স্ট সেল্ফ্ লাস্ট—এই হচ্ছে আমার মোটো। ভালভাবে ডিউটি কর, খুশী থাকব, কাজে ফাঁকি দিলে কিছুতেই রেহাই পাবে না, সেলাম ক'রে ক'রে ঘাড় বেঁকিয়ে ফেললেও পাবে না। বুঝলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, যাও।'

ছোকরা ঘাড় হেঁট ক'রে চ'লে গেল। তার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ ভুবন সোম। হঠাৎ ভাল লেগে গেল ছেলেটিকে, বস্তির ছেলেগুলো প্রায় ডেঁপো হয়, এ সে রকম নয়। পকেট থেকে নোটবুক বার ক'রে নামটা লিখে নিলেন। যদি সুযোগ পান তুলে দেবেন ছোকরাকে। পাইপে আবার তামাক ভরতে লাগলেন।

নিবিষ্ট চিত্তে পাইপটি মনোমত ক'রে ভ'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন মিনিটখানেক। একটা মাছরাঙা পাখী জলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সেটা, পাখা দুটো কাঁপতে লাগল খালি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, ছোট একটা মাছ মুখে ক'রে উড়ে গেল পর-মুহূর্তে! দৃশ্যটা ভারি ভাল লাগল তাঁর। পাইপে টান দিলেন, টান দিয়েই মনে পড়ল, ধরানো হয় নি এখনও। দু-তিনবার চেষ্টা ক'রেও ধরানো গেল না, বড্ড জোর হাওয়া। উঠে কেবিনের ভিতর গেলেন, সেখানে নিপুণভাবে পাইপটি ধরিয়ে ফিরে এলেন আবার। আবার ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। মাছরাঙা পাখীটাকে আর দেখতে পেলেন না। পাইপে টান দিতে দিতে আবার নিজের অতীত জীবনে ফিরে গেলেন তিনি।

···শুধু বোনদের নিয়ে নয়, ভাই দুটিকে নিয়েও কম ভুগতে হয় নি তাঁকে। দুটির মধ্যে একটিরও পড়াশোনা হয় নি। পড়াশোনা করলেই না। প্রতিটি ক্লাসে এক-আধবার নয়, তিন-চারবার ক'রে ফেল মারতে লাগল দুজনেই। ফোর্থ ক্লাসেই গোঁফ উঠে গেল। ভুবন সোম তবু হাল ছাড়েন নি। কিন্তু স্কুলের হেড মাস্টার মহাদেববাবু ছিলেন কড়া লোক, তিনি দুটোরই নাম কেটে দূর ক'রে দিলেন। ভুবন সোমকে বললেন, ওদের স্কুলে রাখা চলবে না, ছোট ছোট ছেলেদের সিগারেট খাওয়া শেখাচ্ছে। লেখাপড়ার ওইখানেই ইতি হয়ে গেল। মা বলেছিলেন ওদের কলকাতায় বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াতে। ভুবন সোমের সামর্থ্যে কুলোয় নি। এ নিয়ে মা কিছুদিন ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করলেন, তারপর থেমে গেলেন। ভাই দুটি লেখাপড়ায় সুবিধা করতে পারে নি যদিও, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে নাম করেছিল। বিপনে গোঁফ

কামিয়ে এমন 'ফিমেল' পার্ট করতে লাগল যে, ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল চারিদিকে। আর খোক্‌না নাম করেছিল ফুটবল খেলায়। দিগ্বিজয়ী সেণ্টার ফরোয়ার্ড হয়েছিল সে। এক হিসেবে ভালই হয়েছিল বলতে হবে, বি. এ., এম. এ., পাস ক'রে আর কটা ল্যাজ গজাত, গজালেও সেই ল্যাজ গুটিয়ে চাকরিই তো করতে হ'ত শেষ পর্যন্ত বিপ্‌নে খোক্‌নাও চাকরি পেয়েছে, ভাল চাকরি। থিয়েটারের জোরেই ইঞ্জিনিয়ারিং আপিসে চাকরি হয়ে গেল বিপ্‌নের। ওর 'সীতা'র পার্ট দেখে ইঞ্জিনিয়ারিং আপিসের বড়বাবু একেবারে কেঁদে কাদা হয়ে গেলেন। তার পরদিনই ডেকে চাকরি দিলেন ওকে। খোক্‌নারও তাই। খেলার জোরে চাকরি। মোহনবাগানের খেলা ছিল একটা বাজে টিমের সঙ্গে। সবাই জানত গোহারান হারবে বাজে টিমটা। কিন্তু জিতে গেল খোক্‌না থাকাতে। খোক্‌না তাদের হয়ে সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলেছিল। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন মেকেঞ্জি লায়ালের বড় সাহেব। খোক্‌না তাঁর নজরে প'ড়ে গেল, ফলে চাকরিও হ'ল। ভুবন সোম পাইপ টানতে টানতে ভাবতে লাগলেন, মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা। অথচ···

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি। একটা চরে অজস্র চখাচখী ব'সে রয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে। লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। এখানে নৌকা ক'রে আসা যায় না? অনিল কি ব্যবস্থা করেছে কে জানে! যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ চখাগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

শিকার করাটাই এখন তাঁর একমাত্র শখ। শুধু শখ নয়, মুক্তির উপায়। সংসারের ঝামেলা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে পালিয়ে আসবার নানা ক্ষেত্র তিনি খুঁজেছেন সারা জীবন। পান নি। ছবি

এঁকেছিলেন দিন কতক। এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গার্ড তাঁকে ওয়াটার-কলারে দীক্ষা দিয়েছিল। খাসা লোক ছিল মিস্টার ব্রাউন। মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে যেত বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে চমৎকার লোক ছিল। ওর পাল্লায় প'ড়ে ভুবন সোম দু-এক চুমুক মদও খেয়েছেন মাঝে মাঝে। আপত্তি করলে বলতেন, জলে আর মদে কোন তফাত নেই, কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর তফাত। তারপর হা-হা ক'রে হেসে বলতেন, সেই জন্যে দামেরও তফাত, একটার দাম কিছু নয়, আর একটা 'টেন রূপিজ পার বট্‌ল্‌!' সেকালে দশ টাকায় এক বোতল ভাল স্কচ হুইস্কি পাওয়া যেত। ব্রাউন তাঁকে ছবি আঁকতে শিখিয়েছিল। ছবি এঁকেছিলেন দিন কতক, এঁকেছিলেন—মানে, আঁকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হয় নি কিছুই। নিশ্চিন্ত মনে বসতেই দেয় নি কেউ তাঁকে। ছুটি তো মাত্র একটি দিন—রবিবার। আর সেই দিনই যত রাজ্যের ফরমাশ। চাল আনো, ডাল আনো, ধোপা আসছে না—খবর নাও, ছেলেদের জামা করাতে হবে—দরজী ডাকো। বাড়িতে অতগুলো হুমদো ছোঁড়া দু বেলা ভাত মারছে, কেউ কুটোটি নেড়ে সাহায্য করবে না, তারা করতে চাইলেও গিন্নী করতে দেবে না। ওরা নাকি ভাল পারে না। সব ভুবন সোমকে একা করতে হবে। কাজকর্ম সেরে দুপুরের দিকে যেই ছবি আঁকতে বসতেন, অমনি একপাল ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াত, বর্ষাকালে আলো জ্বাললে যেমন গাঁধি-পোকা আসে ঠিক তেমনি। কেউ এটা টানছে, কেউ ওটা ঘাঁটছে, কেউ খুনসুটি করছে, কেউ জলের বাটিটাই উলটে দিলে, একবার রঙের বাক্সটাই ফেলে দিলে তাঁর ভাগ্নেটা। কাউকে কিছু বলবার জো নেই, বললেই তাদের মায়েদের মুখ ভার। একদিন আপিস থেকে ফিরে দেখলেন,

অর্ধ-সমাপ্ত তাঁর একটা ছবিতে কাদা মাখিয়ে রেখেছে কে। গিন্নী নির্বিকারভাবে বললেন, 'হয় বিলু না হয় নিপুর কাণ্ড। তোমার মত ওদেরও হয়তো ছবি আঁকবার শখ হয়েছে, বাপকে যা করতে দেখবে তাই তো করবে ওরা, ওদের আর দোষ কি? বিলুটা কাল তোমার মত প্যাঁকাটি ধরিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল।' ছেলে দুটোর পা ধ'রে শানে আছাড় মারবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু অনেক ইচ্ছার মত সে ইচ্ছাও দমন করেছিলেন সেদিন। কয়েকদিন পরে বড় তুলিটাই গায়েব হয়ে গেল। গিন্নী বললেন, 'ইঁদুরে নিয়ে গেছে বোধ হয়। তোমাকে কতদিন থেকে বলছি ইঁদুরের একটা ব্যবস্থা কর, তা তুমি কিছুতেই করবে না, তোমার তুলি তো তুচ্ছ, লক্ষ্মীর আসনই কেটে নিয়ে গেছে।' একটা জাঁতিকল কিনে আনলেন, ইঁদুর ধরা পড়ল না, একটা ভাগ্নের আঙুল কেটে গেল। সে নিয়ে কি তুমুল হৈ-চৈ বাড়িতে। ডাক্তার ওষুধ ইন্‌জেক্‌শন— নগদ পনেরোটি টাকা বেরিয়ে গেল।

এই চলছে সারাটা জীবন। আর একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করেছেন—যাতে তাঁর আনন্দ, বাড়ির মেয়েদের ঠিক তার উপরই আক্রোশ। সোজাসুজি বাধা দিতে পারে না, কারণ বাধা দেবার শক্তি নেই, কিন্তু মনে মনে গজরাতে থাকে। তাঁর স্ত্রীর জ্বালাতেই ছবি আঁকা ছাড়তে হ'ল তাঁকে। কারণ ছবি আঁকতে গেলে বাড়িতে এমন একটা পরিবেশ হওয়া দরকার যা ছবি আঁকার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর জ্বালায় তাঁর বাড়িতে তা হ'ল না, হওয়া যে অসম্ভব ছিল তা নয়। হ'ত না, হতে দিত না। মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর জন্য নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছিল ভুবন সোমকে। কিন্তু একটি উপকার করেছিলেন তিনি, ওই দজ্জাল বাঘিনী বউটাকে দাবিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি

যতদিন বেঁচেছিলেন টুঁ শব্দটি করতে পারে নি। তিনি মারা যাবার পর থেকেই থুড়িলাফ খেতে লাগল।

পাইপ টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ভুবন সোম। তারপর উঠে পায়চারি করলেন একটু। আবার বসলেন।

হ্যাঁ, ছবি আঁকার শখ বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাঁকে। ব্রাউন সাহেব মারা যাওয়াতে উৎসাহের উৎস শুকিয়ে গেল আরও। অদ্ভুত এবং শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিল লোকটার। রিটায়ার করবার পর সে মাঝে মাঝে কোথায় বেরিয়ে যেত। পরে জানা গেল, মাঠে বা জঙ্গলে ব'সে ছবি আঁকে। রেল-লাইনের ধারে ব'সে ছবি আঁকছিল একদিন। লাইনটা বেঁকে গিয়েছিল সেখানে। এক ছুটন্ত ইঞ্জিন এসে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে গেল তাকে। ড্রাইভারের দোষ ছিল না, সে দেখতেই পায় নি তাকে, যখন পেল তখন আর অত স্পীডে থামবার উপায় ছিল না, তখন ব্রেক কষলে ইঞ্জিনই উলটে যেত। ব্রাউন সূর্যাস্তের ছবি আঁকছিল, তার নিজের রক্তেই ক্যান্‌ভাসটা লালে লাল হয়ে গেল।

হ্যাঁ, ছবি আঁকা ছাড়তে হয়েছিল ভুবন সোমকে। কিছুদিন কিছুই করেন নি। কিন্তু ছুটির দিনে কিছু একটা নিয়ে না থাকলে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

অতঃপর তিনি অবসর-বিনোদনের যে উপায়টি অবলম্বন করেছিলেন সেটিও শেষ পর্যন্ত ফলপ্রদ হয় নি, কারণ গোড়াতেই গলদ হয়েছিল তাঁর। অবসর-বিনোদন মানে অবসর-বিনোদন, ওর সঙ্গে আর কিছু জড়াতে গেলেই সব মাটি হয়ে যায়। অবসর-বিনোদনও হবে, আর তার সঙ্গে সংসারের উপকারও হবে—এ রকম গোঁজামিলন শেষ পর্যন্ত সুখকর হয় না, টেকেও না। ইংরেজিতে

লেখা একটা বই একবার হাতে এসে পড়ল তাঁর, তাতে নানা রকম আচার মোরব্বা জ্যাম জেলি করবার ফরম্যুলা ছিল। হঠাৎ তাই নিয়ে মেতে উঠলেন তিনি। গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এর জন্যে ইংরেজি বাংলা বই কিনলেন, তৈজসপত্র কিনলেন, এমন কি নতুন রকম উনুনও একটা তৈরি করালেন যাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারেন। ঘুপচি রান্নাঘরে উনুনের কাছে উবু হয়ে ব'সে রান্না করবার চেয়ে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করা কম কষ্টকর। মেয়েদের জন্যেও তিনি ওই রকম উঁচু উনুন করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওরা রাজী হয় নি, ঠাট্টা করেছিল তাঁকে। আশ্চর্য এই মেয়ে জাত! যাই হোক, নিজের জন্যে বারান্দায় বেশ চমৎকার একটি উনুন করিয়েছিলেন তিনি। পয়সা থাকলে বিলিতি লোহার 'ওভেন' কিনতেন, কিন্তু তত পয়সা ছিল না তাঁর। এতেই ধার করতে হয়েছিল। তোড়জোড় ক'রে নূতন পথে পা দিলেন একদিন। আশা করেছিলেন, এক ঢিলে দুটো পাখী মারতে পারবেন—অবসর-বিনোদন ক'রে আনন্দ-লাভও হবে, সংসারের উপকারও হবে। তাঁর সহধর্মিণী জীবনে কখনও কোন বিষয়ে সহযোগিতা করেন নি তাঁর সঙ্গে। এ বিষয়েও করলেন না। একটি মন্তব্য করেছিলেন শুধু, কথাগুলো ছররার মত তাঁর মনে বিঁধে আছে এখনও। তিনি যেদিন পেয়ারার জেলি করবার জন্যে পাকা পেয়ারা কিনে আনলেন, গিন্নী পেয়ারাগুলোর দিকে একনজর চেয়ে বলেছিলেন—'সব কম্মে হয়েছ যশী, বাকি আছে শুধু ভীম একাদশী।' ফরসা-কাপড়-পরা মেছুনী সব। কে যেন বলেছিল, 'যত সব এঁটো-কলাপাতা শিবের মাথায় উড়ে এসে পড়েছে।' ঠিক বলেছিল। গিন্নীর কথায় অবশ্য দমেন নি ভুবন সোম, অধিকতর উৎসাহে লেগে পড়েছিলেন।

প্রতি রবিবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নিয়েই মেতে থাকতেন। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো এই সময় তাঁর সহায়তা করেছিল খুব। তাঁর চেয়েও বেশী মেতে উঠেছিল তারা। এসব কাজে ফাই-ফরমাশ খাটবার লোক না থাকলে কাজ এগোয় না। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো হামে-হাল হয়ে থাকত। কাউকে কিছু একটা বললেই হ'ল, অমনি ছুটে চ'লে যাচ্ছে। কি উৎসাহ তাদের! সে কদিন সত্যিই তারা খুব খেটেছিল। ওরা অমন ক'রে না খাটলে কাজ এগোত না। বাড়ির মেয়েরা তো সাহায্য করতই না, উল্‌টো বাগড়া লাগাবার চেষ্টা করত। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে গিন্নী কোনদিন মাথা ঘামান নি, কে কোন্ ক্লাসে পড়ে তাও বোধ হয় জানতেন না। তিনি হঠাৎ একদিন ব'লে বসলেন, 'রবিবারে ছেলেমেয়েগুলো কোথায় পুরনো পড়া পড়বে, হাতের লেখা লিখবে—তা নয়, চরকির মত ঘোরাচ্ছ ওদের! এটা আন, ওটা আন, এটা ধর, ওটা ধর!' সর্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠেছিল ভুবন সোমের, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করেন নি তিনি। দিনকতক পরে গিন্নীর কথায় আর অঙ্গও জ্বলত না। গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল—আব বা আঁচিলের মত, গ্রাহ্যই করতেন না। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিলে পড়লেন তিনি, যখন ওগুলো তৈরি হ'ল। শিশি শিশি জ্যাম জেলি মোরব্বা আচার, টিন টিন বিস্কুট—এত সব খাবে কে? বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো খেলে দিন-কতক। বড়গুলো ছুঁলে না। ডেকে জোর ক'রে দিলে খেত অবশ্য, কিন্তু মাথা নীচু ক'রে মুচকি মুচকি হাসত, যেন রসিকতা করা হচ্ছে তাদের সঙ্গে। গিন্নী একদিন বললেন, 'কেন ওই সব অখাদ্যগুলো জোর ক'রে খাওয়াচ্ছ ওদের? অসুখ করবে যে!' ভোনাটার পেট-খারাপ হতেই হৈ-হৈ প'ড়ে গেল বাড়িতে, যেন ইতিপূর্বে তার আর কখনও পেট-খারাপ

হয় নি! জন্মে থেকেই যে ও পেট-রোগা, এটা ভুলে গেল সবাই। খোঁড়া কুণ্ডু ডাক্তারটা তারস্বরে চেঁচাতে লাগল—'ফুড-পয়জনিংয়ের সব সিম্‌টম্‌ মিলে যাচ্ছে।' হাড়-হারামজাদা ছিল ব্যাটা। বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড লাগিয়েছিল—ঘনশ্যাম কুণ্ডু এম. ডি., এফ. ডি. এস.। এফ. ডি. এস. মানে—ফিমেল ডিজিজ স্পেশালিস্ট। পাছে লোকে বুঝতে না পারে তাই বাংলা হরফেও লিখে দিয়েছিল 'স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ'। গরিব ঘরের জোয়ান জোয়ান মেয়েদের ব্যাটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখত সামনে, আর বিদঘুটে বিদঘুটে প্রশ্ন করত তাদের। মুদির দোকান ছিল আদি কুণ্ডুর, তার ছেলে ঘনা, চক্রবর্তীর বাগানে দেওয়াল টপকে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে প'ড়ে পা-টি ভাঙে। তাতেও চৈতন্য হয় নি। নেংচে নেংচে সারা শহরময় ঘুরে বেড়াত, হেন দুষ্কার্য নেই যা করে নি। সেই ঘনা একদিন সাইনবোর্ড টাঙিয়ে হয়ে গেল ডাক্তার কুণ্ডু, দামামা পিটিয়ে প্র্যাকটিস করতে লাগল তাঁর বাড়ির সামনেই, প্রবীণ চন্দর ডাক্তারকে ঠাট্টা করত আড়ালে। অথচ ওই চন্দর ডাক্তার না থাকলে ও বাঁচতই না। উঃ, এ দেশে কী না হয়! সবই সম্ভব। ভোনাটার জন্যে ভাল ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি এসে বললেন, 'না, ফুড-পয়জনিং নয়, তবে ওসব আর খেতে দেবেন না ছেলেদের।' বাস্‌, আর যাবে কোথা? যে আলমারিতে ওই জ্যাম-জেলি-আচার-মোরব্বার শিশিগুলো ছিল গিন্নী তাতে তালা মেরে দিলেন একটা, যাতে কেউ সেগুলো দেখতে পর্যন্ত না পায়। তাঁর এক দূর-সম্পর্কের বিধবা পিসি ছিলেন, তিনিই কেবল বললেন, 'খাসা হয়েছে তোর আমের আচার। ওরা কেউ না খায় আমিই খাব।' কিন্তু আমের আচার মাত্র চার শিশি ছিল, পিসিমাকে দিয়ে দিলেন সেগুলো, কিন্তু বাকি জিনিসগুলো নিয়ে কি করা যায়?

শেষটা কেষ্টার শরণাপন্ন হলেন একদিন। তাঁর বন্ধু বিষ্টু মিত্তিরের ছেলে কেষ্টা মনিহারির দোকান করেছিল একটা। তাকে গিয়ে একদিন বললেন, সে যদি ওগুলোর কোনও গতি ক'রে দিতে পারে। কেষ্ট ছেলে ভাল। সে বললে, 'জেঠামশাই, আমি জিনিসগুলো দোকানে রেখে দিতে পারি, কিন্তু কেউ নেবে না। ফুড-পয়জনিংয়ের একটা গুজব র'টে গেছে কিনা।' কোনও একটা দরকারী জিনিসের খবর নিতে যাও কারও কাছে, বলবে—জানি না, কিন্তু ফুড-পয়জনিংয়ের খবরটা সবাই জানে। 'আশ্চর্য দেশ! জঘন্য—জঘন্য!'—কথা ক'য়ে উঠলেন ভুবন সোম, তারপর পাইপে একটা টান দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাইপ নিবে গিয়েছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে আবার কেবিনের দিকে যাচ্ছিলেন পাইপ ধরাতে, কেবিনের দ্বার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন। মনে হ'ল, এত জোর হাওয়ায় পাইপ ধরাবার চেষ্টা বৃথা, বার বার নিবে যাবে, তামাকই উড়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে সিগার ধরাবার চেষ্টা করা যাক। ফিরে এসে ব্যাগ থেকে সিগার বার করলেন। সেটি নিপুণভাবে দাঁত দিয়ে কেটে আবার গেলেন কেবিনের দিকে। সিগার-প্রসঙ্গে একটি মজার কথা মনে পড়ল তাঁর। অনেক দিন আগেকার ঘটনা। কথাটা অবশ্য মজার নয়—দুঃখের, কিন্তু মজাই লেগেছিল তাঁর। সিগার কিনে আনবার জন্যে একবার তিনি তাঁর ভাগ্নে হনুকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়েছিলেন। ভাগ্নেটি কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে বললে, বাজারে ভিড়ের মধ্যে নোটটা পকেট থেকে কে তুলে নিয়েছে সে বুঝতে পারে নি, তাই ধারে সিগার এনেছে কেষ্টর দোকান থেকে। আজকাল বাজারে পিক-পকেটের অভাব নেই, তাই কথাটা খুব

বেশি অবিশ্বাস করেন নি ভুবন সোম। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ওরই পকেট থেকে ওরই ছোট ভাই জাম্বু বার ক'রে ফেললে নোটটা। জামাটি খুলে হনু স্নান করতে গিয়েছিল, সেই অবসরে জাম্বু ওর পকেট সার্চ ক'রে ফেলেছে। সেই সময় ভাগ্যে গিন্নী এসে পড়েছিল তাই বামালসুদ্ধ ধরা পড়ল, তা না হ'লে নোটটি সম্ভবত ও-ই গাপ করত। জাম্বুর বয়স তখন মাত্র আট, সেই বয়সেই সুযোগ পেলে ও সকলের পকেট হাঁটকাত। দৌহিত্র দুটির সার্থক নামকরণ করেছিলেন মা—হনুমান আর জাম্বুবান।

ভুবন সোম সিগারটি ধরিয়ে আবার বাগিয়ে বসলেন ঈজিচেয়ারে। বিগত জীবনের আচার-মোরব্বার শিশিগুলি আবার ভেসে উঠল তাঁর মানসপটে। বিলিয়ে দিতে হয়েছিল সেগুলোকে। তাও কি কেউ নিতে চায়? বাড়ির কাছাকাছি কেউ নিলে না, তিনি দেনও নি। ও-সব খেয়ে যদি কারও সামান্য কিছু অসুখ হ'ত তা হ'লে ওই খোঁড়া শালা রটাত যে ফুড-পয়জনিং হয়েছে। পাড়ার কাউকে দেন নি, দূরের লোকদের দিয়েছিলেন। তাও খোসামোদ ক'রে দিতে হয়েছিল। যখন টুরে বেরুতেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন। সঙ্কুচিত মুখে বলতেন, 'নিজে হাতে করেছি, খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে।' কোনও বাঙালীর মুখ দিয়ে 'ধন্যবাদ' কথাটা বেরোয় নি, প্রশংসাও না। দোষই বরং ধরেছিলেন কেউ কেউ। মৃগেন ভাদুড়ীকে ভিনিগারে-ভেজানো ম্যাংগো-স্লাইস দিয়েছিলেন। তিনি পরে একদিন বললেন, 'খেতে পারলুম না মশাই, পচা আমানির গন্ধ।' সম্ভবত জীবনে ও-জিনিস প্রথম খেলেন। গুপ্ত বললে, 'পেয়ারার জেলিটা বড্ড বেশি টক হয়ে গেছে।' চরণ মুকুজ্যে বললে, 'এ কি বিস্কুট মশাই, ঠিক

খাপড়ার মত।' জ্যাম খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল কিন্তু ফোরম্যান মিস্টার স্মিথ। সাহেব কিনা! সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ তো দিয়েইছিল, তারপর লম্বা চিঠিও লিখেছিল একখানা, জ্যাম তৈরি করবার নূতন একটা রেসিপিও পাঠিয়ে দিয়েছিল। আলাদা জাত ওরা, গুণীর সমঝদার, ভদ্রতাজ্ঞান আছে, কোথায় কি করতে হয় জানে, তাই দাবড়ে ছুনিয়াটা শাসন ক'রে বেড়াচ্ছে। ওদের সঙ্গে এঁরা গেছেন টক্কর দিতে! কেমন এক চালে মাত ক'রে পাকিস্তানটি ঘাড়ে চড়িয়ে দিয়ে গেল! শুধু পাকিস্তান কেন, হিন্দুস্থানেও কি শান্তি আছে? প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ঝগড়া। এখন ভোগ কর স্বাধীনতা। মাউণ্টব্যাটেন মহাত্মা গান্ধিকে বলেছিল, 'মিস্টার গান্ধি, ইওর কংগ্রেস ইজ নাউ উইথ মি।' এ কথার অর্থ, যেই একটু ক্ষমতার গন্ধ পেয়েছে অমনি হামলে পড়েছে তোমার ভক্তের দল। গান্ধিকে মেরেই ফেললে। এক হিসেবে অবশ্য ভালই হয়েছে, ইদানীং ওঁর যে রকম মতিগতি হচ্ছিল তাতে নিদেন পক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রত্যেকটি লোককে উনি মসজিদে নিয়ে গিয়ে কলমা পড়িয়ে তবে ছাড়তেন। কথাটা ভেবে নিজেরই খারাপ লাগল তাঁর। মনে মনে গান্ধিজিকে ভক্তিই করতেন তিনি। লোকটা যে অসাধারণ রকম অদ্ভুত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বহুকাল আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। তখন মিস্টার এম. কে. গান্ধি—মহাত্মা গান্ধি হন নি, ভুবন সোমও এ. টি. এস. হন নি। ভুবন সোম তখন সামান্য কেরানী, থার্ড ক্লাসের পাস পান। বারহারোয়া স্টেশনে একটা থার্ড ক্লাস গাড়িতে চড়েছেন, গাড়িতে অসম্ভব ভিড়, তবু নজরে পড়ল প্রকাণ্ড পাগড়ি-পরা রোগা একটি লোক এক কোণে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছেন।

তাঁর পাশে ব'সে আছে দাড়িওলা এক বুড়ো। কে তো কে, কত রকম চেহারাই তো ট্রেনে দেখা যায়! প্রথমটা গ্রাহ্য করেন নি ভুবন সোম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে হ'ল। বুড়োটা একটু পরে কাশতে কাশতে ঘড় ঘড় ক'রে খানিকটা কফ তুললে এবং সেটা বাইরে না ফেলে হড়াৎ করে ফেললে গাড়ির মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ি-পরা লোকটি খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে হিন্দিতে বললেন, এটা অন্যায় করলেন আপনি, মেঝের উপর থুতু ফেলছেন কেন? বাইরে ফেলুন। অতিশয় সঙ্গত প্রতিবাদ। দাড়িওলা বুড়োটি কিন্তু হাড়-হারামজাদা। কথার জবাবই দিলে না প্রথমটা। হাঁপাতে লাগল। হাঁপানির ধাক্কাটা সামলে স্বরূপটি প্রকাশ করলে তারপর। চোখ পাকিয়ে বললে, ঠাণ্ডা লেগে তার বুকে সর্দি বসেছে, জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে আরও ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে, সুতরাং সে গাড়ির মেঝেতেই থুতু ফেলবে। এতে যদি কেউ অসুবিধা বোধ করেন তিনি অন্যত্র যেতে পারেন। গাড়ি কারও বাপের সম্পত্তি নয়। ভুবন সোমের রাগে সর্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠেছিল, কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। অকারণে পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলে মহা মুশকিলে পড়তে হয়—অনেক ধাক্কা খেয়ে এটা পূর্বেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। চুপ ক'রেই রইলেন তিনি। ওই রোগা পাগড়ি-পরা লোকটি কিন্তু যা করলেন তা অদ্ভুত। তিনি খানিকটা খবরের কাগজ ছিঁড়ে নিজে হাতে মেঝে থেকে কফটা তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। দাড়িওলা বুড়ো চোখ পাকিয়ে চেয়ে দেখল, কিছু বলল না। তারপর আবার কাশির ধমক এল তার, আবার সে হোয়াক ক'রে মেঝেতেই গয়ের ফেললে। পাগড়ি-পরা লোকটি আবার সেটি কাগজে পুঁছে বাইরে ফেলে দিলেন। গাড়িসুদ্ধ লোক ব'সে ব'সে নিখরচায় মজা দেখছিল। দূর থেকে

মজা দেখাটাই আমাদের জাতীয় স্বভাব—পথে কোথাও সামান্য একটু কিছু হ'লেই হ'ল, অমনি ভিড় জ'মে যায়। বুড়োটা তৃতীয় বার কফ ফেললে গাড়ির মেঝেতে, পাগড়ি-পরা লোকটি তৃতীয় বার সেটা কাগজে তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। বুড়ো এবার চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইল পাগড়ি-পরা লোকটার দিকে, তারপর হিন্দিতে বললে, 'এ আপনি কি করছেন!' পাগড়ি-পরা লোকটি কিছু না ব'লে মৃদু হাসলেন শুধু—অপূর্ব মিষ্টি হাসিটি—ভুবন সোম অমন মিষ্টি হাসি আর কখনও দেখেন নি। গাড়ির সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল, বুড়োর কাশির ধমক আবার কখন আসবে। ঠিক যেন একটা ফুটবল ম্যাচ দেখছিল সবাই। একটু পরেই কাশির চতুর্থ ধমক এল, কিন্তু এবার বুড়ো আর কফটা গাড়ির মেঝেতে ফেললে না, মুখ বাড়িয়ে বাইরেই ফেললে। হো-হো ক'রে হেসে উঠল গাড়িসুদ্ধ লোক। এর পরই ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামল। দেখা গেল, কয়েকজন ভদ্রলোক ফুলের মালা হাতে নিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। পাগড়ি-পরা লোকটি নামতেই তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হ'ল। তখন ব্যাপারটা জানা গেল। ওই পাগড়ি-পরা রোগা লোকটি আফ্রিকা-ফেরত ব্যারিস্টার, দিগ্বিজয়ী মিস্টার এম. কে. গান্ধি।

…ভুবন সোম সিগারে টান দিতে দিতে চরের দিকে চেয়ে পা নাচাতে লাগলেন।

কত জিনিসই দেখলেন জীবনে, আর জীবনটাও দেখতে দেখতে কেমন কেটে গেল—সকাল সন্ধ্যা রাত্রি কতবার এল আর গেল। মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন চাকরিতে ঢুকেছি—। ওটা কি? মাছ-রাঙা? উঠে দাঁড়ালেন তিনি। না, মাছরাঙা নয়। এ পাখী

আগে অনেকবার দেখেছেন, নামটা জানা নেই। হাঁস কি কোন রকম? না, হাঁসের চেহারা নয় ঠিক। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, একটি ভদ্রলোক বাইনাকুলার দিয়ে পাখীটিকে দেখছেন। এগিয়ে গেলেন সেদিকে ভুবন সোম। ভদ্রলোক চোখ থেকে বাইনাকুলার নাবাতেই চোখাচোখি হ'ল তাঁর সঙ্গে।

'কি পাখী ওটা বলুন তো, নাম জানেন?'

'ইংরেজি নাম টার্ন (tern), ল্যাটিন নাম Sterna aurantia gray, বাংলা নাম ঠিক জানি না। কেউ কেউ গাংচিল বলেন, কিন্তু আমার মনে হয় ওটা ভুল।'

'ও!'

ভুবন সোম অবিলম্বে স'রে এলেন তাঁর কাছ থেকে, এসে আবার চেয়ারে বসলেন। মনে মনে বললেন, একটি রত্ন দেখছি। এখানে এসে আবার বিদ্যে ফলাতে না শুরু করে! আজকাল এই এক নতুন ধরনের ফ'ড়ে হয়েছে! ও-পাখীর ল্যাটিন নাম বলবার কি দরকার ছিল তোর! কেবল নিজের বিদ্যে জাহির করবার চেষ্টা, আর কিছু নয়।

নানাভাবে ঘা খেয়ে খেয়ে মানুষের সঙ্গই আর ভাল লাগে না তাঁর। আচার-মোরব্বা ছেড়ে যখন শিকারে যেতে আরম্ভ করলেন তখন সঙ্গে একজন না একজন বন্ধুকে নিয়ে আসতেন। আজকাল আর আনেন না। তাদের কচকচির জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠতে হ'ত। যে মুক্তির আশায় শহরের ঝামেলা থেকে পালিয়ে আসা, সেইটেই পাওয়া যেত না।

ভূতনাথ নিজের কেরদানির গল্প করত খালি, ও ছাড়া আর অন্য কথা কইতে জানে না সে। কি ক'রে সে সাহেবকে থ ক'রে

দিয়েছিল, বড় সাহেবের মেম কেন তাকে বার বার ডেকে পাঠায়, তার স্ত্রীর হাতের লেখা মুক্তোর মত ব'লে তার ছেলেটার হাতের লেখাও ঠিক ছাপার অক্ষরের মত, হেড মাস্টারটা তাকে পারশিয়ালিটি ক'রে প্রমোশন দেয় নি, কিন্তু তার হাতের লেখা দেখামাত্রই গডসন্ সাহেব নিজের আপিসে লুফে নিয়ে নিলে তাকে, তার জামাই এত বড়লোক যে ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ না ক'রে কোথাও যায় না—ক্রমাগত এই সব গল্প। থামতে জানে না, ব'লে চলেছে তো ব'লেই চলেছে।

ভূতনাথকে বাদ দিয়ে দ্বিজেনকে নিয়ে এলেন একবার। ও যে অমন একটা নরক, তা ধারণা ছিল না তাঁর। আপিসে আড়ালে আবডালে এক-আধটা অশ্লীল কথা বলত, কিন্তু মাঠের মাঝখানে ফাঁকায় এসে একেবারে লাগাম ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। এমন কাঁচা খিস্তি ভুবন সোম ইতিপূর্বে শোনেন নি। তাক লেগে গেল তাঁর। ডিপার্টমেণ্টাল এগজামিনে তিনবার ফেল করেছে, কিন্তু হ্যাভেলক এলিস, অনঙ্গ রঙ্গ, কামসূত্র সব মুখস্থ। ক্রমাগত আওড়াতে লাগল সেই সব। এক-একটা গল্প বলে, চোখ নাচায় আর হা-হা ক'রে হাসে। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধ'রে যায় নিজেরই, তখন একটু বেঁকে দু হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরে আর বলে, 'মাইরি বলছি, এরাই মেরে ফেলবে আমাকে।' একবার হা-হা ক'রে এমন হেসে উঠল যে, ঝিলের পাখীগুলো সব ভড়কেই গেল, রেঞ্জের মধ্যে এলই না আর। সুতরাং দ্বিজেনকে বাদ দিতে হ'ল। ও-রকম লোককে নিয়ে নির্জন ফাঁকা মাঠে আসা যায় না। অথচ ও মনে করে যে, ও যা বলছে তা উচ্চাঙ্গের গল্প সব।

দ্বিজেনের পর এসে জুটল ছট্টু সেন। সে আবার আর এক চীজ। শিকারের সব বাহাদুরিটা একাই নিতে চায়। পাখী

দেখবামাত্র আগে দৌড়ে গিয়ে দড়াম দড়াম ক'রে ফায়ার করতে শুরু করবে, পাখী যদি পড়ে নিজেই গ্রাস করবে সেটা। যদি দুটো পড়ে দুটোই নিজে নেবে, তোমাকে একটাও দেবে না। দাঁত বার ক'রে বলবে, 'এ দুটিতে আমার কি হবে ভাই! রাবণের গুষ্টি, এক টুকরো ক'রেও কুলুবে না। চল, দেখা যাক আরও যদি পাওয়া যায় কয়েকটা!' কিন্তু আর কি পাওয়া যায় দু-দুবার ফায়ারিংয়ের পর! দুবার ছট্টু সেনকে এনেছিলেন, দুবারই এই কাণ্ড। আর তাকে আনেন নি।

বার কয়েক কার্তিক মুকুজ্যেকে সঙ্গে এনেছিলেন। কিন্তু লোকটা ঘোর অপয়া। যতবার নিয়ে এসেছেন, পাখী তো দূরস্থান—পাখীর একটি পালক পর্যন্ত আনতে পারেন নি। একবার একটা লালশরের পায়ে ছররা লাগল, কিছুদূর গিয়ে পড়ল সেটা, ধরাও গেল। কিন্তু ফিরে এসে যেই অনিলের হাতে দিতে যাবেন অমনি হাত ফসকে সেটাও উড়ে গেল। এ ঘটনার পর থেকে কার্তিককেও আর আনেন না।

কাউকেই আর আনেন না, এমন কি অনিলকেও নয়। অনিল ছেলে ভাল, কোনরকম বদচাল নেই, কিন্তু তার সামনে শিকার করতে ভয় পান ভুবন সোম। মিস্ করলে ভয়ানক চ'টে যায় ছোকরা। ওর নিজের লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ। কিন্তু ওর বয়স পঁচিশ, আর ভুবন সোমের প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু ও সেটা বুঝবে না। মিস্ করলেই এমন ভুরু কোঁচকাবে যে, তার মুখের দিকে ঘণ্টাখানেক চাওয়া যাবে না। মুখ ফুটে একটি কথা অবশ্য বলবে না, কিন্তু মুখ গোঁজ ক'রে থাকবে। সে আরও অস্বস্তিকর। তাই আজকাল একাই যান ভুবন সোম, কাউকে সঙ্গে নেন না। অনিল অবশ্য সব যোগাড়যন্ত্র ক'রে দেয়।

একা একা যাওয়ার বিশেষ আনন্দ আছে একটা। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আনন্দ, যা খুশী যতক্ষণ খুশী করবার আনন্দ। কেউ বাধা দিচ্ছে না, উপদেশ দিচ্ছে না, কানের কাছে বকবক করছে না। আপিসের দায়িত্ব থেকে, পাড়াপড়শীর উৎপাত থেকে, দেঁতো হাসি আর ছেঁদো কথার একঘেয়ে ভণ্ডামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। মাথার উপর আকাশ, পায়ের নীচে মাটি, চতুর্দিকে গাছপালা, বনজঙ্গল, নদীনালা, খালবিল আর পাখী—এদের মধ্যে তুমি যা খুশী কর, যতক্ষণ খুশী থাক, যতবার ইচ্ছে ফায়ার কর, যতগুলো ইচ্ছে পাখী মার, মারতে পার বা না-পার, কেউ হাসবে না, কেউ ভ্রূকুটি করবে না। পাখী শিকার করতেই তিনি যান বটে, পাখী মারবার চেষ্টাও করেন, কিন্তু পাখী মারাটাই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এখন বয়স হয়েছে, মাংস আর তত ভালও লাগে না। যদিও কখনও কদাচিৎ এক-আধটা পাখী মারতে পারেন, অনিলকেই দিয়ে দেন সেটা। কারণ তাঁর নিজের বাড়িতে খাবার লোক কেউ নেই।

কেউ নেই! সত্যটা রূঢ়ভাবে হঠাৎ এসে আঘাত করলে তাঁকে। গিন্নী অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। সাবিত্রীব্রতটি উদ্‌যাপন করবার বছর খানেক পরেই মারা গেলেন। বাহাদুরি বলতে হবে এটা, কারণ সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন ক'রে সধবা অবস্থায় মারা যেতে বড় একটা দেখা যায় না কাউকে। ভাইরা যে যার জায়গায় চাকরি করছে—একজন কলকাতায়, আর একজন এলাহাবাদে। বিরিঞ্চি জগন্নাথ দুজনেই মারা গেছে। বিরিঞ্চিটা রাক্ষসের মত খেত, মাপা আধ সের চালের ভাত, তদুপযুক্ত ডাল এবং তরকারি। ডায়াবিটিস্ হল, অন্ধ হয়ে গিয়েছিল শেষে। জগন্নাথ মারা গেল টাইফয়েডে, নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ইন্‌ফেক্‌শনটি নিয়ে এল রামপুরহাট থেকে। ওটাও কম পেটুক ছিল না।

বিধবা বোন ছবি এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু সে আছে এখন ছেলেদের কাছে—একজন লিলুয়ায় থাকে আর একজন জামালপুরে। তাঁর খাতিরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বড় সাহেব তুজনকেই রেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি অনুরোধ করেন নি। কারও জন্যে কখনও করেন নি, মাথা নোয়ান নি কারও কাছে কখনও। সাহেবরা সেই জন্যেই বেশি খাতির করত। তাঁর বড় ছেলে বিলু এখন বিলেত-ফেরত মস্ত সায়েব, শ্বশুরের খরচে বিলেতে গিয়েছিল। দিল্লীতে থাকে। সাহেব মানে ঘোর স্বার্থপর। আপনি আর কোপনি, নিজের মাগছেলে নিয়েই ব্যস্ত। ছোট ছেলে নিপুটাই কেবল এতদিন তাঁর কাছে ছিল, সে কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষায় পাস ক'রে রেলে ঢুকেছিল, বেশ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটাও দাগী হয়ে গেল। প্রথমটা বুঝতে পারেন নি তিনি। একবার এইরকম শিকার থেকে ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে পারলেন। সেবার এক ফায়ারে অনেকগুলো 'টিল' পড়েছিল। প্রায় বিশ-পঁচিশটা। অনেক বিতরণ ক'রেও গোটা পাঁচ-ছয় থেকে গেল। বাড়ি নিয়ে এলেন। ভাবলেন নিপুটা রাঁধবে। তাঁর দূর-সম্পর্কের এক বিধবা পিসিমা নিরাশ্রয় হয়ে তাঁর কাছে আছেন, তিনিই আজকাল রাঁধেন বাড়েন, কিন্তু তিনি মাংস ছুঁতে চান না। ভুবন সোমও জোর করেন না। মাংস হ'লে নিপুই রাঁধে। টিলগুলো দেখে পিসিমা বললেন, 'মহা মুশকিল হ'ল দেখছি। নিপুও বোধ হয় ওসব ছোঁবে না আর। সব যোগাড় ক'রে দিচ্ছি, তুমিই না হয় আলাদা স্টোভে চড়িয়ে দাও।' শুনে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন তিনি, নিপু মাংস ছোঁবে না মানে? হঠাৎ হ'ল কি! পিসিমা বললেন, 'ও জটাবাবার কাছে মন্ত্র নিয়েছে যে। নিরামিষ খাচ্ছে কদিন থেকে। ভোরে উঠে নাক টিপে প্রাণায়াম করে।'

নিপু তখন বাড়িতে ছিল না। নিজেকেই রাঁধতে হ'ল। নিপু বাড়ি এলে জিগ্যেস করলেন তাকে, 'তুমি নিরামিষ খাচ্ছ শুনলাম, ব্যাপার কি!' নিপু বললে, 'আমি মন্তর নিয়েছি, গুরুদেব বৃথা মাংস খেতে বারণ করেছেন।' ভুবন সোম তখুনি ছোঁড়া চাকরটাকে বেলপাতা পেড়ে আনতে বললেন। বাড়ির ঠিক পাশেই হেলে-পড়া বেলগাছ আছে একটা। তৎক্ষণাৎ বেলপাতা এসে গেল। ভুবন সোম তখন নিপুকে বললেন, 'এই বেলপাতায় মন্তরটি লিখে এখুনি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এস। এসে মাংসের ঝোল মেখে ভাত খাও। ও-সব বুজরুকি এ বাড়িতে চলবে না।'

নিপু মুখ গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বেরিয়ে গেল। কিছুতেই মাংস ধরাতে পারলেন না তাকে। তারপর বলা নেই কওয়া নেই স'রে পড়ল একদিন। খবর পেলেন, আপিসেও যায় নি, আপিস থেকে ছুটিও নেয় নি। পরে জানা গেল, গুরুদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কাশীতে গেছে। সুতরাং চাকরিটি গেল। নিজের ছেলে ব'লে এতবড় অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন না তিনি, ছেলে ব'লে আরও বেশি ক'রে পারেন না। সে নাকি তার গুরুর আশ্রমে গিয়ে বাস করছে আজকাল, সেখানকার ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ে মাস্টারি করে। যে তিনবার চেষ্টার পরে থার্ড ডিভিশনে আই. এ. পাস করেছে, সে মাস্টারি করে! ভাগ্যে বিয়ে দেন নি, দিলে বউটার হাড়ির হাল হ'ত।

হঠাৎ আবার মনে হ'ল, এখন বাড়িতে তিনি একা। তিনি আর ওই অথর্ব পিসিমা। যে বাড়ি করবার জন্যে কত হাঙ্গামা, কত মেহনত, কত লোকের কাছে ছুটোছুটি, কত জায়গায় চড়া সুদে টাকা ধার করা, সেই বাড়ি এখন খাঁ-খাঁ করছে, চামচিকে আর চড়ুই পাখীর আড্ডা হয়েছে। আপন জন কেউ নেই। তিনি

চোখ বুজলে মেরামতের অভাবে ইটের স্তূপ হয়ে যাবে ছ দিন পরে।···

সিগারে মৃদু টান দিতে দিতে পায়ের পাতা নাচাতে লাগলেন ভুবন সোম। না, পাখীর প্রতি লোভ নেই তাঁর। পাখী শিকার করবার জন্যে আসেন না তিনি। ভিড় থেকে হাঁফ ছাড়বার জন্যে পালিয়ে আসেন, বাইরের খোলা-মেলা জায়গায় অন্যমনস্ক হয়ে নিজেকে ভুলে থাকার জন্যে চ'লে আসেন মাঝে মাঝে। এবার কিন্তু পাখী মারতে হবে। ওই অনিল আর ছট্টু সেনকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তিনিও ইচ্ছে করলে পাখী মারতে পারেন। প্রায়ই মারতে পারেন না তা সত্যি, হাত কেঁপে যায় তাও সত্যি, কিন্তু ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই তিনি মারতে পারেন। এবার প্রমাণ ক'রে দিতে হবে সেটা। অনিলটা অবশ্য সঙ্গে যেতে চাইবে, কিন্তু তিনি কাউকে সঙ্গে নেবেন না। যে ভদ্রলোকটি বাইনাকুলার নিয়ে পাখী দেখছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে ভুবন সোমের দিকেও চেয়ে দেখছিলেন।

আশ্চর্য লোকটি, নিজের সঙ্গেই কথা কইছেন!

॥ তিন ॥

জাহাজ অবশেষে জেটিতে এসে ভিড়ল। ঘাটে ট্রেন আগেই এসেছিল। যে ঘাট একটু আগে প্রায় জনশূন্য ছিল তা জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষের লোকই যেন ভিড় করেছে এসে। কত রকমের চেহারা, কত রকমের মোট-ঘাট, কত রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ, কত রকমের বেয়াদপি, কত রকমের ভদ্রতা! যাত্রীদের চিৎকার, কুলিদের হাঁকাহাঁকি, ফেরিওলাদের বিচিত্র ডাক, ভিখারীদের 'মিলে বাবা এক পয়সা,' পুলিসের হুমকি—সরগরম হয়ে উঠেছে জায়গাটা। ঘাট-গাড়ির যাত্রীরা আগেই এসেছিল, এবার জাহাজের যাত্রীরা নামতে লাগল। মনে হ'ল, দুটো নদী যেন মিশল দু দিক থেকে এসে। অনিল একটু ফাঁকায় একটা উঁচু জায়গার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। জাহাজ থেকে যে জনস্রোত নামছিল তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সে। ভুবন সোমের সোলার টুপিটা প্রথমে তার নজরে পড়ল, তারপর মুখের সিগারটা। এগিয়ে গেল। সামনাসামনি হতেই ঝুঁকে প্রণাম করল।

'থাক্, থাক্—'

ভুবন সোম মুখে ও-কথা বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে খুশী হলেন। আজকালকার অনেক ছেলেমেয়েই হেঁট হয়ে গুরুজনদের প্রণাম করে না। অনেকে 'কুড়ুলে পেন্নাম' করে। কেউ কেউ বিহারীদের নকল ক'রে 'নমস্তে' বলতে শিখেছে, কেউ কেউ আবার 'জয় হিন্দ'। 'রাম রাম' শোনেন নি এখনও কারও মুখে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাটা অপমানজনক মনে করেন ওঁরা। বন্ধুর

ছেলে বিজয়া-দশমীর দিন বাড়িতে এল, মিষ্টিগুলি গপ গপ ক'রে খেলে, কিন্তু প্রণাম করলে না, এও দেখেছেন ভুবন সোম। অনিল ও-দলের নয়। ভাল বংশ যে। বংশের মহিমা যাবে কোথা ?

'হাতে ওটা কি ?'

অনিলের হাতে একটা কাগজের ঠোঙায় কি যেন ছিল।

'কলাইয়ের ডাল। আপনার জন্যে কিনলুম। এখানে হর্‌বন্‌সের দোকানের ডালটা খুব ভাল।'

'হিং আছে বাড়িতে ?'

'আছে।'

'হিংয়ের ফোড়ন দিতে বলিস। বউমা ভাল আছে তো ?'

'ভাল আছে। তবে ওরা এখানে কেউ নেই, বাপের বাড়ি গেছে।'

'ও। রান্নাবান্না করছে কে ?'

'ঠাকুর আছে।'

'মৈথিল ? তবেই সেরেছে! রাঁধে কেমন ?'

'ভালই রাঁধে।'

'চল্‌, ওঠা যাক। কুলিটা কোথায় গেল—এই, ইধার লে আও—'

ট্রেনের অভিমুখে অগ্রসর হলেন তিনি। অনিল পিছু পিছু চলল। একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা খালি ছিল, তাতেই গিয়ে চড়লেন। জানলার ধারে একটি সীটে বাগিয়ে ব'সে সিগারটি ধরালেন। তারপর অনিলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এবার ভাল বিলিতি টোটা এনেছি।' তারপর হেসে বললেন, 'গেল বারের কথা মনে আছে তোর ? ছি-ছি, কি দুর্বুদ্ধিই হয়েছিল! ও-সব কি আমাদের কম্মো! ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো গেলে কেউ আর গরু কিনত না। মাঝ থেকে কিছু পয়সা জলে দিয়েছিলাম কেবল।'

অনিলের মুখও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গত বছর ভুবন সোম নিজেই বাড়িতে টোটা তৈরি করেছিলেন। বাইরে থেকে দেখতে মন্দ হয় নি। ফায়ার করবার পর আওয়াজও হয়েছিল, কিন্তু ছররাগুলো বেশিদূর গেল না। কয়েক হাত গিয়েই মাটিতে ঝর ঝর ক'রে প'ড়ে গেল। একটি ছররা কোন পাখীকে স্পর্শ পর্যন্ত করে নি, শব্দ শুনে পালিয়ে গেল তারা। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পাখীর খুব কাছে যাবার চেষ্টাও করেছিলেন, তবু লাগল না। একটি পাখীও মারতে পারেন নি গেল বার।

'এবার কি ব্যবস্থা হয়েছে? পাখী এসেছে?'

'গঙ্গার চরে খুব এসেছে।'

'সেখানে যাব কি ক'রে?'

'একটা মোষের গাড়ি ব্যবস্থা করেছি। আমারই গাড়ি। সেই গাড়ি ক'রে ভোরে কিষণপুর যেতে হবে। সেখান থেকে হাঁটাপথে যেতে হবে আরও কিছুদূর, তারপর গঙ্গার চর পাওয়া যাবে। সেই চরে অনেক পাখী বসছে আজকাল। চখা, গীজ, টিল, পিনটেল—সব রকম আছে। আমি গিয়েছিলাম একদিন। বলেন তো আপনার সঙ্গেও যেতে পারি।'

'না, আমি একলাই যাব '

অনিল এইটেই প্রত্যাশা করছিল। এ প্রসঙ্গে হয়তো আর একটু আলোচনা হ'ত, কিন্তু সখীচাঁদ যাদব একটা নূতন গড়গড়া নিয়ে হাজির হওয়াতে তা আর হ'ল না। সখীচাঁদ ভুবন সোমকে ঝুঁকে একটা নমস্কার ক'রে অনিলকে বললে, 'এখানে হুঁকো পাওয়া গেল না। আমাদের রাধানাথবাবু এই গড়গড়াটি কাল আনিয়েছেন, এখনও ব্যবহার করা হয় নি। এইটেই নিয়ে যান।'

'বেশ।'

গড়গড়াটি গাড়ির কোণে রেখে ভুবন সোমকে আর একবার ঝুঁকে নমস্কার ক'রে, ভিজে বেড়ালের মত মুখ ক'রে সখীচাঁদ গাড়ি থেকে নেবে গেল। যাবার আগে একটা আধুলিও দিয়ে গেল অনিলের হাতে। হুঁকো কেনবার জন্যে এটা সে সখীচাঁদকে দিয়েছিল একটু আগে। সখীচাঁদকে দেখে ভুবন সোমের মনে পড়ল, তার নামে যে রিপোর্ট করেছিলেন সেটা এখনও পাঠানো হয় নি। ফিরে গিয়েই পাঠাতে হবে। যত বয়স হচ্ছে স্মৃতিশক্তি ততই ক'মে আসছে।

গড়গড়াটার দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন, 'গড়গড়া কার জন্যে ?'

'আপনার জন্যে। আপনার জন্যে কাটিহার থেকে যে হুঁকোটি আনিয়েছিলাম সেটা ভেঙে গেছে। এখানে সখীচাঁদবাবুকে একটা হুঁকোই কেনবার জন্যে পয়সা দিয়েছিলাম, কিন্তু এখানেও পাওয়া গেল না।'

'ও-গড়গড়া তুমি ফেরত দিয়ে এস। ওতে আমি তামাক খাব না।'

'খাওয়াদাওয়ার পর তামাক না খেলে আপনার কষ্ট হবে না ? ভাল তামাক আনিয়ে রেখেছি।'

'কিছু কষ্ট হবে না। ও-গড়গড়া তুমি ফেরত দিয়ে এস।'

অগত্যা গড়গড়া নিয়ে অনিলকে আবার নাবতে হ'ল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ভুবন সোম অনিলের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। স্নানাহার সারতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মৈথিল ঠাকুরের রান্না খেয়ে খুব খুশী হলেন তিনি। বললেন, 'এ যে মেয়েদেরও কান কেটেছে রে! এ রকমটা তো প্রায় দেখা যায় না!

যত্ন করিস ব্যাটাকে।' ভুবন সোম যার উপর খুশী হতেন তাকে 'ব্যাটা' বলতেন, আর যার উপর চটতেন তাকে বলতেন 'বেটাচ্ছেলে।'

অনিল তামাকের সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছিল। ভাল অম্বুরী তামাক, টিকে, কলকে—সব। হুঁকোটাই ছিল না শুধু।

ভুবন সোম বললেন, 'এক কাজ কর্। তোদের তো অনেক কলাগাছ রয়েছে। মোটা দেখে একটা ডাঁটা কেটে আন্। আমি হুঁকো বানিয়ে নিচ্ছি।'

তাই হ'ল। পশ্চিমের বারান্দায় ব'সে তামাক খেতে খেতে ভুবন সোম আপন মনেই ব'লে উঠলেন, 'এমন দিনও গেছে, যখন ছু হাত দিয়ে কলকে ধ'রে তামাক খেয়েছি। উনি আবার আমাকে গড়গড়া দেখাতে এসেছেন!' অনিল ঘরের ভিতর তাঁর শোবার জন্য বিছানা করছিল, শুনে মুচকি হাসলে একটু। একা একা আপন মনে কথা কওয়া ভুবন সোমের অনেক দিনের অভ্যাস। ঠিক মনে হয়, যেন কারও সঙ্গে কথা কইছেন।

অনিল বেরিয়ে এসে বললে, 'কাকাবাবু, বিছানা হয়ে গেছে। এবার আপনি একটু বিশ্রাম ক'রে নিন।'

'ঘুম হবে না। দিনে ঘুমনো অভ্যাস নেই, আপিস করতে হয়, আর ছুটির দিন হয় শিকার না হয় মাছ ধরা। তবু একটু শোব।'

একটি ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে শুলেন ভুবন সোম। শোওয়ার সময় উপন্যাস পড়া তাঁর বহুকালের নেশা। আসবার সময় উপন্যাসটি হুইলার থেকে কিনে এনেছিলেন। প্রথম পাতাটি প'ড়েই ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন তিনি। প্রথম পাতাতেই ছু-ছুটো খুন। মেয়ে আর তার মাসী, ছুজনকেই গুলি করেছে।

রিভলভারও একটি নয়, তিনটি। তিনটি রিভলভারই ঘরের মধ্যে পাওয়া গেছে। জমজমাট ব্যাপার। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রেই পাতা কয়েক প'ড়ে গেলেন তিনি, তারপর সশব্দে বইটা বন্ধ ক'রে দিলেন। অতি বাজে গল্প। ঘুমও হ'ল না। সামনের দেওয়ালে অনিলের বাবার ছবি টাঙানো ছিল একটা। ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'ম'রে বেঁচেছ দাদা। বেঁচে থাকলে অনেক দুর্গতি হ'ত। পুণ্যবান লোক তাই ড্যাংডেঙিয়ে চ'লে গেছ, আমাদের অদৃষ্টে কি যে আছে ভগবানই জানেন!'

উঠে পড়লেন তিনি। বিছানা থেকে নেবে কপাটটা খুলে পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। অনিলকে দেখা গেল না। কিন্তু সিগারেটের গন্ধ পাওয়া গেল। ভুবন সোমের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল একটা। ছোকরা সিগারেট ধরেছে তা হ'লে! আড়ালে খাচ্ছে, তবু ভাল। খুশী হলেন তিনি। ছেলেটা সত্যিই ভাল, অমন বাপের ছেলে ভাল হবেই তো, আজকালকার হতভাগা ছোঁড়া হ'লে নাকের উপরই ধোঁয়া ছেড়ে দিত। ভুবন সোম জুতোটি প'রে কামিজটি গায়ে দিয়ে সন্তর্পণে নেবে গেলেন। গেলেন সেই জমিটা দেখবার জন্য। অনিলদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে যে জমিটা আছে, সেখানে ভুবন সোম একদিন বাড়ি করবেন ঠিক করেছিলেন। তাঁর পৈতৃক বাড়িটা যখন ধারে বিক্রি হয়ে গেল তখন তাঁকে সপরিবারে পথে দাঁড়াতে হ'ত যদি অনিলের বাবা তাঁদের আশ্রয় না দিতেন। সদাশয় লোক ছিলেন অনিলের বাবা। তিনিই যোগাড়যন্ত্র ক'রে ওই জমিটা নামমাত্র খাজনা আর সেলামিতে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন জমিদারের কাছ থেকে। বলেছিলেন, 'এইখানেই আপাতত ঘর বাঁধ তোমরা, পরে পয়সা হ'লে শহরে

জমি কিনো। ঘরের ভিত পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মায়ের জেদাজিদিতে শেষ পর্যন্ত বাড়ি আর হয় নি এখানে। চড়া সুদে টাকা ধার ক'রে ওই শহরেই জমি কিনে বাড়ি করতে হয়েছিল ভুবন সোমকে। এই জমিটা কিন্তু এখনও আকর্ষণ করে তাঁকে। অতীতের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। তখন বুচকুন চাকরটা বেঁচে ছিল, ছুলাল বেঁচে ছিল, টুনি ছিল, টগর ছিল···। তাই যখনই এখানে আসেন জমিটাকে একবার দেখে যান। এবার কিন্তু জমির ভিতর ঢুকতে পারলেন না তিনি। জমিটাকে ঘিরে রাংচিতার বেড়া দেওয়া রয়েছে। কেউ কিনেছে বোধ হয়! গত বছর পর্যন্ত এমনি প'ড়েই ছিল। বেড়ার ধারেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবন সোম। দেখলেন, জমির মাঝখানে—যেখানে তিনি বৈঠকখানা করবেন ভেবেছিলেন—একটা খড়ের আটচালা রয়েছে। তার ভিতর ঢেঁকিতে সুরকি কুটছে ছুজন মজুরনী। ভুবন সোমকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দিলে একজন, আর একজন মুচকি হাসল। 'আ মোলো।'—ব'লে ভুবন সোম সেখান থেকে স'রে গেলেন। ফিরে এসেই দেখা হ'ল অনিলের সঙ্গে।

'কোথা গিয়েছিলেন আপনি কাকাবাবু? কফি তৈরি।'

'কফি? কফি খাচ্ছ নাকি আজকাল?'

'না, আপনার জন্যে আনিয়েছি। কাটিহার থেকে আনিয়েছি। এখানে ভাল চা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আমি জানি আপনি বিকেলে কফি খান।'

ভুবন সোম স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন অনিলের মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'আনিয়েছ যখন খাব কফি। কিন্তু কাজটি অন্যায় করেছ।'

'অন্যায় কেন?'

'আমাকে পর ক'রে দিয়েছ। আমি তোমাদের ঘরের লোক, ঘরে যা থাকবে তাই খেয়ে আনন্দ করব। আমার জন্যে আলাদা কিছু বন্দোবস্ত করেছ মানেই আমাকে পর মনে করছ।'

'না না, এ কথা বলছেন কেন? বাবার জন্যেও তো কত কিছু আনাতে হ'ত। দিনাজপুর থেকে কাটারিভোগ চাল, কলকাতা থেকে গাওয়া ঘি, ভাজা মুগের ডাল, গয়ার তামাক—আপনি নিজেই এনে দিয়েছেন কতবার—'

'আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলে না তুমি। যাক, চল, কতক্ষণ কফি ভিজিয়েছ?'

'মিনিট দুই-তিন হবে।'

'আর একটু ভিজুক।'

দুজনে ভিতরে গেলেন।

কফিপর্ব শেষ হ'ল যথাকালে। একটু পরেই মৈথিল ঠাকুরটি একটি বড় 'টাইমপিস' ঘড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অনিল সেটি তার হাত থেকে নিয়ে বললে, 'ঠিক আছে তো? সেবার তো খারাপ ক'রে দিয়েছিল!'

'বললেন তো ঠিক চলছে।'

ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপার কি, কার ঘড়ি?'

'ঘড়ি আমারই। পোস্টমাস্টারবাবুর ছেলেটির সামনে পরীক্ষা, তাই চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। রোজ এলার্ম দিয়ে ভোরবেলা উঠে পড়ে। আজ আমাদেরই উঠতে হবে তাই আনিয়ে রাখলাম।'

ভুবন সোম মন্তব্য করলেন, 'চাওয়ার জ্বালায় অস্থির! ভাগ্যে আমাদের চোখ-কান-হাত-পাগুলো শরীর থেকে খোলা যায় না, গেলে তাও চেয়ে নিয়ে যেত। চেয়ে চেয়ে আমার গ্রামোফোনটার দফা তো নিকেশ ক'রে দিয়েছে। রেকর্ডগুলো

তো একটিও গোটা নেই, সেদিন দেখি স্প্রিংটাও ভেঙে দিয়েছে, আর ঘুরছে না। আপদ গেছে, নিশ্চিন্ত হয়েছি। তুমি ঘড়িটা বাজিয়ে দেখে নাও। কিচ্ছু বলা যায় না, হয়তো কার্যকালে বাজবে না। কটার সময় উঠতে হবে ?'

'দুটোর সময়। চা-টা খেয়ে বেরুতে তিনটে বাজবে। সেখানে ভোরের আগে পৌঁছনো দরকার। গাড়ির গাড়োয়ানকেও আজ রাত্রে এখানে শুতে বলেছি।'

'ভাল করেছ। গাড়ি এখানে আছে তো ?'

'গাড়ি তো আমার নিজেরই। মোষ দুটো এবার নতুন কিনেছি।'

'আগে তো তোমাদের গরুর গাড়ি ছিল, মোষ কিনতে গেলে কেন ? মোষ জানোয়ারটা সুবিধের নয়। যমের বাহন—'

'বর্ষাকালে মোষের গাড়ি ছাড়া চলে না। এখানকার রাস্তা যা খারাপ, বর্ষাকালে গরুতে টানতে পারে না। এখানকার রাস্তা-ঘাট ভাল হয়ে যাবে শুনছি—মোটরেব্‌ল্ রোড হবে নাকি—সেণ্ট্রাল গভর্মেণ্ট টাকা দিচ্ছে—'

'আমিও শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করি না যে, হবে। এদের জনকয়েক হচ্ছে ভাল অভিনেতা, স্টেজে ভাল বক্তৃতা দেয়, মনে হয় যেন আকাশের চাঁদ পেড়ে কিষাণদের পিলসুজটিতে বসিয়ে দেবে, আর বাকিগুলো চোর—ছিঁচকে চোর। টাকা হয়তো খরচ হবে, কিন্তু সেটা পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খেয়ে ফেলবে। ভাল রাস্তা হবে না। সে আশা ক'রো না।'

ভুবন সোম ঈজিচেয়ারটাতে অঙ্গ প্রসারিত করলেন, তারপর সিগার ধরালেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে ধূমপান ক'রে বললেন, 'রাত্রে সকাল সকাল খেয়ে শোব। লাইট খাবারের ব্যবস্থা ক'রো।'

'আপনার জন্যে সরু-চাকলির ব্যবস্থা করেছি। তাই তো আপনি খান?'

'মৈথিল ঠাকুর সরু-চাকলি করতে পারবে?'

'ও সব পারে। আপনার সঙ্গেও কিছু খাবার দিয়ে দেব।'

'দিও। ওই চরে খিদে পেলে বিপদে প'ড়ে যাব। ওখানে তো বালি ছাড়া আর কিছু নেই।'

'একটু দূরে গ্রাম আছে। দুধ পাবেন—'

'রাম বল। দুধ খাবে কে। দুধ হজমই হয় না—'

॥ চার ॥

দুর্গানাম স্মরণ ক'রে ঠিক ভোর তিনটের সময় মহিষ-বাহিত শকটে আরোহণ করলেন ভুবন সোম। গাড়িতে মোটা ক'রে বিছানা করা ছিল, কম্বল তো ছিলই, লেপও দিয়ে দিয়েছিল অনিল।

'আপনি লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ুন কাকাবাবু। সকাল হতে হতে পৌঁছে যাবেন। বলেন তো আমিও যাই সঙ্গে। জায়গাটা আপনার অচেনা তো, এর আগে কখনও যান নি।'

'না না, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি আর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না, শুয়ে পড়গে যাও।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাবার পর ভুবন সোম অনুভব করলেন, মহিষ দুটি যদি এই রকম বেগে দৌড়য় তা হ'লে ঘুম তো হবেই না, শরীরের হাড়গুলি আস্ত থাকবে কি না সন্দেহ।

'তোমার নাম কি বাবা?'

'ভুট্টা।'

'একটু আস্তে চালাও।'

'জী হুজুর।'

গাড়ি কিছুক্ষণ আস্তে চলল। লেপটি মুড়ি দিয়ে ভাল ক'রে শুলেন ভুবন সোম।

ছপ্‌পর-দেওয়া গাড়ি, বিছানাটিও বেশ মোটা আর নরম, আরামেই চোখ বুজলেন তিনি। সামান্য একটু তন্দ্রাও এসেছিল, কিন্তু ভেঙে গেল। মোষ দুটো আবার ছুটছে। তিনি কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে বাইরে মুখ বাড়ালেন। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ

উঠেছে এক ফালি। সেই ম্লান জ্যোৎস্নায় যা তিনি দেখলেন তাতে শিউরে উঠলেন। ভুট্টা যা করছে তাতে মোষ কেন হাতীও ছুটবে। সে মোষ-দুটির পিছনের পায়ের ফাঁক দিয়ে নিজের পা ঢুকিয়ে দিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছে মোষ দুটোকে। কি সর্বনাশ, এ তো মেরে ফেলবে দেখছি। এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিঙওলা মোষকে কাতুকুতু দিলে ক্ষেপে গিয়ে ওরা কি না করতে পারে!

'বাবা ভুট্টা!'

'জী হুজুর।'

'তুমি চাপটালি খেয়ে ব'স। পা ঝুলিও না।'

ভুট্টা একটু অবাক হয়ে ফিরে চাইল তাঁর দিকে। ঠিক বুঝতে পারল না, বাবু কি করতে বলছেন।

'কি হুজুর? কি কহৈলে কহিছ?'

ভুবন সোম তার মুখের বিস্ময় ভাবটা দেখতে পেলেন না। তখনও বেশ অন্ধকার ছিল, কিন্তু এটা তিনি বুঝলেন যে 'চাপটালি' কথাটি ওর বোধগম্য হয় নি। ও কথার হিন্দি প্রতিশব্দ তাঁরও জানা ছিল না। তিনি হিন্দি ভাল জানেন না, জানবার চেষ্টাও করেন নি কখনও। বিহারীদের সঙ্গে তিনি হয় বাংলায় না হয় ইংরিজিতে কথা বলেন। যারা বাংলা ইংরিজি কিছুই বোঝে না, তাদের কাছে ভাঙা ভুল হিন্দি ব'লেই কাজ চালিয়ে নেন। চাপটালির হিন্দি প্রতিশব্দ না জানার দরুন যে এমন বিপদে পড়বেন তা ভাবেন নি ইতিপূর্বে। মোষ দুটো আবার খুব জোরে ছুটতে লাগল, ছপ্পরে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। এ কি এক উন্মাদ লোকের হাতে ছেড়ে দিলে তাকে অনিল! মোষ দুটোকে ক্রমাগত কাতুকুতু দিয়ে যাচ্ছে! এই অন্ধকারে খানায় খন্দে না ফেলে দেয়! বুড়োবয়সে হাড় ভাঙলে আর জুড়বে না। চাটুজ্যে বুড়োবয়সে

পায়ের হাড় ভেঙেই ম'ল। গ্যাংগ্রিন হ'ল শেষটা। তিনি হিন্দিতেই অবশেষে বললেন, 'ভুট্টু, পয়ের ঝুলায়কে নেই বৈঠো।'

'তব হাঁকবে কৈসে বাবু?'

'মহিষ কো কাতুকুতু নেই দেও।'

'কুতু? কুতু কোন্ চিজ ছে?'

কাতুকুতুর হিন্দিও ভুবন সোমের জানা নেই। মহা মুশকিল!

'এতনা জোর সে নেই হাঁকাও।'

'বহুৎ দূর যাইলে পড়তে যে। বাবু কহি দেল্‌কে, আঁধার রহতে রহতে পৌঁছা দে।'

'না বাবা, তুমি আস্তে চল।'

'তব কিরিণ উগি যাইতে, চিড়িয়া নেহি মিলতে।'

ভাবার্থটা বুঝতে পারলেন ভুবন সোম—সূর্য উঠে যাবে, পাখী পাওয়া যাবে না।

'না মিলুক, তুমি আস্তেই চল একটু।'

ভুট্টা কিন্তু কর্ণপাতই করলে না তাঁর কথায়। পর-মুহূর্তেই একটা মোষের পিঠে দমাস্ ক'রে এক ঘা লাঠি বসিয়ে ব'লে উঠল, 'বাবু হেনো বুলৈছে, শালা বোচা!'

এর প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পারলেন ভুবন সোম। বাবুর মত হাঁটছেন, শালা কুমীর। একটু কৌতুক অনুভব করলেন তিনি। যে আইন অনুসারে মানুষকে বাঁদর বললে গালাগালি দেওয়া হয়, ভুট্টা সেই আইনই অনুসরণ করেছে, বেআইনী কিছু করে নি। কিন্তু এ রকম গালাগালি এই প্রথম শুনলেন তিনি।

'একটু আস্তে আস্তে চালা বাবা। বেঘোরে প্রাণটা না যায়!'

'তোঁ শুতি রহনি রেজাই ওড়িকে। কুছু ডর নেহি ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে একটি মোষের ল্যাজ মুচড়ে তালু ও জিহ্বার সহযোগে টক্ টক্ শব্দ করতে লাগল সে। ভুবন সোম অনুভব করলেন, মানা ক'রে একে নিরস্ত করা যাবে না। প্রথমত ভাষায় কুলুচ্ছে না, দ্বিতীয়ত অনিলের আদেশ—তাড়াতাড়ি পোঁছে দিতে হবে। সে আদেশ ও অমান্য করবে না। কিন্তু এইভাবে গাড়ি চললে তো তাঁর শরীরের সব কব্জাগুলোই ঢিলে হয়ে যাবে, বন্দুকই ধরতে পারবেন না। তখন তিনি এক কৌশল অবলম্বন করবেন ভাবলেন। গল্প ক'রে ওকে যদি একটু অন্যমনস্ক ক'রে দেওয়া যায় তা হ'লে হয়তো ফল হতে পারে। মহিষ দুটোর দিকে ও যদি একাগ্র হয়ে থাকে তা হ'লে আজ আর নিস্তার নেই। কিন্তু কি গল্প করবেন ওর সঙ্গে! ও পলিটিক্স বোঝে না, পরচর্চাও করা যাবে না ওর সঙ্গে, রেলওয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা বিলিতি নভেলের মর্মও ওর অজ্ঞাত। চাষবাস সম্বন্ধে কিছু বললে হয়তো ও আলাপ করতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে নিজেই তিনি কিছু জানেন না। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ শুরু করলেন তাই।

'ভুট্রা, তোমার নামটি তো চমৎকার! কে রেখেছিল এ নাম?'

'মৌসি।'

'মাসী? বাঃ!'

তখন ভুট্রা নিজের জন্মকাহিনী বলতে লাগল। শুনে ভুবন সোমের মনে হ'ল, এ তো দ্বিতীয় বুদ্ধদেব দেখছি। ভুট্রার জন্ম নাকি ভুট্রাক্ষেতেই হয়েছিল, ওর আসন্নপ্রসবা মা তখন ভুট্রা কাটছিল। ভুট্রাকে প্রসব ক'রে সেই ক্ষেতেই মৃত্যু হয় ওর মায়ের। ওর মাসী তখন ওকে 'গোদ' নেয়, অর্থাৎ পোষ্যপুত্র হিসাবে মানুষ করতে থাকে। তারপর ওর 'মৌসা' অর্থাৎ মেসো যখন মারা গেল তখন ভুট্রার বাবা তার বিধবা শালীকেই বিয়ে ক'রে ফেলল। ভুট্রাক্ষেত

অবশ্য লুম্বিনী উদ্যান নয়, কিন্তু মিল আছে অনেক। ভুবন সোম যা আশা করেছিলেন তাই হ'ল, গল্প করতে করতে ভুট্টা মহিষ দুটির প্রতি আর মন দিতে পারল না তত। গাড়ির গতি বেশ মন্থর হয়ে এল। কিন্তু গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দ্বিগুণ উৎসাহে ঠেঙাতে শুরু করলে মোষ দুটোকে আর নাক দিয়ে এক রকম 'খাঁ' 'খাঁ' শব্দ করতে লাগল। ল্যাজও মোচড়াতে লাগল আবার মোষের পেটের তলায় পাও চ'লে গেল ফের। অন্যমনস্কতা-জনিত গাফিলতিটা সে যেন সুদসুদ্ধ সংশোধন করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ল। মরি বাঁচি ক'রে ছুটতে লাগল মোষ দুটো।

'আস্তে—আস্তে—একটু আস্তে বাবা।'

ভুট্টা হাসিমুখে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে তাঁর দিকে, ভীত শিশুর দিকে বয়স্করা যেমন ভাবে চায়। একটু একটু আলো ফুটছিল, তার মুখটা তিনি দেখতে পেলেন এবার। ব্যাটা হাসছে! রাগে সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল তাঁর। কিন্তু এখন ক্রোধ প্রকাশ করলে চলবে না, কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

আবার প্রশ্ন করলেন তাকে, 'কি খেতে ভালবাস তুমি ভুট্টু?'

'জী?'

'কোন্ খানা তুমরা পসিন্ হ্যায়?'

'বুটরো সাততু।'

'বুটের ছাতু? হামার ভি পসিন্ হ্যায়।'

ভুট্টা ঘাড় ফিরিয়ে হাসল।

'গুড় দেকে, না, তেল মিরচাইন দেকে?'

'যো কুছু হোয় সবহি আচ্ছা।'

'ভাত ভালবাসতা হ্যায়, না, রোটি?'

'রোটি।'

'আর তরকারি ?'

'করেলা।'

উচ্ছে দিয়ে রুটি খেতে কেমন লাগে! আশ্চর্য রুচি তো!

'আলু পরবল ?'

'হ্যাঁ, উসব ভি কুছ কুছ। মগর করেলারো ছোকা পেয়াজরো সাথ, বড়ি আচ্ছা ছে।'

গাড়ির গতি বেশ মন্থর হয়ে এল। ভুবন সোম স্থির করলেন, খাদ্য-প্রসঙ্গই এখন চালিয়ে যেতে হবে কিছুক্ষণ। একটু ভাবতে চেষ্টা করলেন পেঁয়াজের সঙ্গে উচ্ছে ভেজে রুটি দিয়ে খেতে কেমন লাগবে! তাঁর তো বমি হয়ে যাবে। অথচ ওই হ'ল ওর প্রিয় খাদ্য। ভূত কি আর গাছে ফলে! কিন্তু ঠিক এই সময়ে যা ঘটল তাতে খাদ্য-প্রসঙ্গ হারিয়ে গেল। একসঙ্গে সমস্ত পাখীগুলো ডেকে উঠল। ভুবন সোম হকচকিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বললেন না, বলতে পারলেন না। ভোরে পাখীরা ডাকে, চিরকাল ডেকেছে, এই অতি-প্রত্যাশিত ব্যাপারটাই এত অপরূপ মনে হ'ল তাঁর কাছে যে, তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। উঠে বসলেন এবং স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে।

মহিষগুলোও আর ছুটছিল না, ভাল রাস্তা পেয়ে স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল, মনে হচ্ছিল তারাও যেন উপভোগ করছে ব্যাপারটা। ভুবন সোম দেখলেন, পূর্বাকাশ অরুণ-রাগরঞ্জিত হয়েছে। শহুরে-মানুষ ভুবন সোমের কি ভালই যে লাগছিল! ভুট্টা কিন্তু বিশেষ বিচলিত হয় নি, মাছের কাছে জলের অভিনবত্ব নেই, এসব সে রোজই দেখছে। মিলের চোঙা দেখলে সে বরং বিস্মিত হ'ত। সে কেবল ব্যস্ত হচ্ছিল কি ক'রে বাবুকে সে ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে পারবে। মহিষ দুটিকে পুনরায় উত্তেজিত

করতে শুরু করেছিল সে। ভুবন সোম আর মানা করলেন না। বেশ লাগছিল। একটু পরে বেশ আলো ফুটল। ভুবন সোম আর মহিষের বিষয় চিন্তাই করছিলেন না। রাস্তার দু পাশে সবুজ ক্ষেতের সারি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। মুগ্ধ নেত্রে তাই দেখছিলেন। কি গাছ ওগুলো? ধান? না, ধান তো এ অঞ্চলে হয় না। ভুট্টাকে প্রশ্ন করলেন। ভুট্টা একটা গোল গোছের উত্তর দিল।

'গহুম, য আর বুট ছে।'

গম, যব আর ছোলা? কোন্‌টা গম, কোন্‌টা যব আর কোন্‌টাই বা ছোলা! হঠাৎ একটু লজ্জিত হলেন ভুবন সোম। কিছুই জানেন না। সারাজীবন বাজে খবর সংগ্রহ ক'রে বেড়িয়েছেন খালি।

পূর্বাকাশ আরও লাল হয়ে উঠল।

হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়াতে বেশ একটু কৌতূহলী হলেন তিনি। ক্ষেতের মাঝখান থেকে ফুর্‌র্‌র্ ক'রে একটা ছোট্ট পাখী আকাশের দিকে সোজা উড়ে গেল, তারপর সেই শূন্য থেকেই গান গাইতে লাগল, ঝুপ ক'রে নেবে পড়ল আবার ক্ষেতের ভিতর। আর একটা উড়ল, আর একটা, আর একটা গানে গানে আকাশ ভ'রে যাচ্ছে।

'ভুট্টা, কি পাখী ওগুলো?'

'ভর্‌থা—'

নির্বিকারভাবে উত্তর দিল । পাখীর গান যেন তার কানেই ঢোকে নি।

'ভর্‌থা! সে আবার কি পাখী?'

'গহুমাকা খেতো পর খোতা বানাই করিকে আন্‌ডা পারৈছে।'

কিছু বুঝলেন না ভুবন সোম। লার্ক বললে বুঝতেন, কিন্তু ‘ভর্‌থা’ বলাতে বুঝলেন না। ভরদ্বাজ বললেও বুঝতেন না, ‘ভর্‌থা’ ভরদ্বাজেরই অপভ্রংশ। গমের ক্ষেতে খোতা মানে বাসা বানিয়ে ওরা ডিম পাড়ে—এ খবর ভুট্টা জানে, অথচ তিনি জানেন না। বেশ লজ্জিত হলেন ভুবন সোম। কিন্তু তিনি এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, লজ্জার ভাবটা মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হ’ল না।

গাড়ি চলতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চলল। চেনা অচেনা আরও অনেক রকম পাখী নজরে পড়তে লাগল। দেখলেন, ভুট্টাও অধিকাংশ পাখী চেনে না। যেগুলো চেনে না সেগুলোকে বলছে ‘জংলি চিড়িয়া’, যে দু-একটার নাম বলল সেগুলো সম্ভবত ভুল। ভুবন সোমই ধ’রে ফেললেন দু-একটা। একটা ফিঙেকে বললে, ‘নীলকন্‌ঠ্’ (নীলকণ্ঠ)। ভুবন সোম নীলকণ্ঠ চেনেন, ফিঙেও চেনেন। ভুট্টাকে বললেন, ‘না, ওটা নীলকণ্ঠ নয়।’

ভুট্টা একটুও অপ্রতিভ হ’ল না। আকর্ণ হেসে বললে, ‘তব দুসরা কুছু হোতৈ।’

অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত একটা কাণ্ড ঘটল।

‘হো হো হো হো—’

তড়াক ক’রে লাফিয়ে পড়ল ভুট্টা। একটা মোষ জোয়াল ফেলে দিয়েছে, কাত হয়ে গেছে গাড়িটা। ভুট্টা কিন্তু মোষটাকে বাগাতে পারলে না। মোষটা উল্টো দিকে ঘুরে চোঁ-চাঁ দৌড় মারল। ভুবন সোম বেকায়দায় প’ড়ে গেলেন একটু। তিনি একটা সিগার ধরাবার চেষ্টায় ছিলেন। নিরস্ত হলেন। দ্বিতীয় মোষটাও পালাবার চেষ্টা করছে। কি আপদ! হঠাৎ ভুট্টা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, ‘আই রে বাপ, বিহনিয়া—’

'বিহনিয়া কি রে?'

'বিহনিয়া ভৈঁস। উতরি যা বাবু, জল্‌দি সে উতরি যা—'

তাড়াতাড়ি গাড়ির পিছন দিক থেকে লাফিয়ে নেবে পড়লেন ভুবন সোম। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তিনি। গাড়ি থেকে নেবেই কিন্তু বুঝতে পারলেন। একটু দূরে ক্ষেতের মাঝখানে আর একটি মহিষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিঙে কাদা মাখা, কুচকুচে কালো গা। মৃদু কিন্তু গম্ভীর মেঃ-মেঃ শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। মাথা ক্রমশই বেঁকছে। ভাব-ভঙ্গি মোটেই ভাল নয়।

কাছেই একটা শিমুলগাছ ছিল। ভুট্টা আদেশের ভঙ্গিতে তাঁকে গাছটায় চড়তে বলল।

'জল্‌দি— জলদি—জলদি চঢ়ি যা বাবু, ই শালা বড়ি বদমাস ছে।'

সে নিজেই ছুটে এসে ভুবন সোমকে পাঁজা-কোলা ক'রে গাছ-তলায় নিয়ে এল, তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, 'ওহি ডালটো পকড়ি লে। জলদি—জলদি—'

নাগালের মধ্যে একটা ডাল ছিল সেইটে ধ'রে ঝুলে পড়লেন তিনি, তারপর ভুট্টার সাহায্যে কোনক্রমে উঠলেন গাছের উপরে। গাছে উঠে দেখলেন সংঘর্ষ বেধে গেছে। আগন্তুক মহিষটা গাড়ির মহিষটাকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করেছে, আর ভুট্টা এক জোড়া দড়ি-বাঁধা বাঁশ নিয়ে ক্রমাগত ঠেঙিয়ে চলেছে আততায়ী মোষটাকে। ভুট্টার বিক্রম দেখে তাক লেগে গেল ভুবন সোমের। ও বাঁশই বা পেলে কোথায়? তিনি জানতেন না যে, গাড়িকে দাঁড় করাবার জন্য ওই রকম দড়ি-বাঁধা বাঁশ প্রত্যেক গাড়ির সঙ্গে থাকে এক জোড়া। 'সিপাহা' ওর নাম। বীরবিক্রমে লড়তে লাগল ভুট্টা। গাড়ির প্রথম মোষটা তো আগেই পালিয়েছিল।

দ্বিতীয়টাও পালাল। দ্বিতীয় মোষটা যখন রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুট দিল তখন আগন্তুক মোষটা আর সেখানে দাঁড়ানো প্রয়োজন মনে করল না, সেও ছুটে চ'লে গেল। সে এসেছিল তার এলাকা রক্ষা করতে। এর পুরো তাৎপর্যটা পরে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ভুট্টাই তাঁকে বলেছিল। বিহনিয়া মোষ হচ্ছে—ব্রিডিং বাফেলো, নিজের এলাকায় সে দ্বিতীয় পুরুষ-মহিষকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। যদি কোনও পুরুষ-মহিষ ঢুকে পড়ে আর সে তা টের পায়, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে এগিয়ে আসবে। মহিষের ওই মেঃ-মেঃ শব্দটারই অনুবাদ হচ্ছে—যুদ্ধং দেহি। যুদ্ধ করতে করতে হয় সে নিজে মরবে, না হয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরে তাড়াবে। যে বিহনিয়ার পাল্লায় ভুবন সোম পড়েছিলেন সেটার নাকি দোর্দণ্ড-প্রতাপ। এ অঞ্চলের কোনও মোষ তাকে হারাতে পারে নি। ডাক্তারবাবুর একটা মোষকে সে নাকি মেরেই ফেলেছে!

ভুবন সোম গাছের উপর থেকে সব দেখছিলেন। তিনটে মোষই যখন রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলে তখন সহসা আর একটা শত্রুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হ'ল তাঁকে। গাছটায় অসংখ্য লাল পিঁপড়ে রয়েছে। কি করবেন ভাবছিলেন, এমন সময় ভুট্টা বলল, 'অব উতরিয়ে হুজুর।'

ভুট্টা খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সেটা। অপ্রত্যাশিতভাবে বিহনিয়ার আবির্ভাব হওয়াটা যেন তারই দোষ। এই শীতেও ঘেমে উঠেছিল বেচারা। ডান হাতের একটা আঙুলও জখম হয়েছিল একটু। কিন্তু এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না তার। বাবুর 'মেহমান' (অতিথি) যে এই বিপদে প'ড়ে গেলেন এর জন্যেই সে লজ্জিত। যে বাঁশ জোড়া দিয়ে বিহনিয়াকে পিটেছিল তারই সাহায্যে সে গাড়িটাকে তুলে

দাঁড় করালে। তারপর কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে ভুবন সোমকে বললে, 'অব উতর যাইয়ে হুজুর।'

নাববার তাড়া ভুবন সোমেরও কম ছিল না, পিঁপড়ে দেখে তিনি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। প্যাণ্টের ভিতর যদি ঢুকে পড়ে তা হ'লে খুবই কাবু ক'রে ফেলবে। ভুট্টার সাহায্য না নিয়ে এক লাফে নেবে পড়লেন তিনি। নেবেই মনে হ'ল, নাবলাম তো, কিন্তু অতঃপর? গাড়ির মোষ দুটো তো পালিয়েছে। পায়ে হেঁটে অগ্রসর হওয়া কি সমীচীন? বিহনিয়াটা মার খেয়ে ছুটে পালাল বটে, কিন্তু আবার যদি ফিরে আসে! আসা অসম্ভব নয়, কাছে-পিটেই গা-ঢাকা দিয়ে আছে। বেশী দূরে যায় নি। বড় বড় কি গাছ ওগুলো? ভুট্টা বললে—রাহার, মানে অড়র গাছ। ওই অড়রক্ষেতেই ঢুকেছে বিহনিয়া, গাছের উপর থেকে দেখেছেন তিনি।

ভুট্টা বললে, না, সে আর আসবে না এখন। কি করা যায় তা হ'লে? ভুট্টা প্রস্তাব করলে, এখান থেকে মহেন্দর সিংয়ের 'ডোটা'য় যাওয়া যাক, বেশী দূর নয়, কাছে। 'ডোটা' কি? মাঠের মাঝখানে সম্পন্ন গৃহস্থ চাষীরা যে আস্তানা করে তাকে এ দেশে 'ডোটা' বলে। ভুট্টা বললে, সে তাঁকে তাঁর মালপত্র সমেত মহেন্দর সিংয়ের ডোটায় পৌঁছে দিতে চায়। সেখানে আর একটা গাড়ি পাওয়াও অসম্ভব নয়। মহেন্দর সিংয়ের নিজেরই গাড়ি আছে। গতবার বৃত্তরের মেলায় এক জোড়া ভাল বলদও কিনেছেন তিনি। অনিলবাবুকে খুব খাতির করেন মহেন্দর সিং। তাঁর মেহমানকেও করবেন। আর মহেন্দর সিংয়ের ডোটা থেকে গঙ্গার চরও খুব বেশী দূর নয়। বাবু ইচ্ছে করেন তো হেঁটেও যেতে পারবেন। হেঁটে গেলেই বরং তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবেন।

গাড়িতে গেলে ঘুর পথে যেতে হবে, দেরি হবে। ভুট্টা তাঁকে পেঁৗছে দিয়ে এসে গাড়ির মোষ দুটোর সন্ধান করবে।

ভুবন সোম দেখলেন, প্রস্তাব অসঙ্গত নয়, মন্দও নয়। এ ছাড়া গত্যন্তরও তো নেই। রাজী হলেন। ভাগ্যে বিহনিয়াটা এসে গাড়িটাতে ধাক্কা মারে নি, তা হ'লে তাঁর বন্দুক টোটা সব নয়-ছয় হয়ে যেত। সাহেবী পোশাক প'রে এসেছিলেন তিনি। চেস্টার-ফিল্ডটি খুলে শুয়েছিলেন। এবারে সেটি গায়ে দিলেন। তারপর বন্দুকটি কাঁধে ক'রে টোটাগুলি পকেটে পুরে হ্যাটটি মাথায় দিয়ে ভুট্টার পিছু পিছু চলতে লাগলেন। অনিল একটা টিফিন-কেরিয়ারে খাবার দিয়েছিল, সেইটে ভুট্টা হাতে ক'রে ঝুলিয়ে নিলে। তাঁর কাঁধে মিলিটারি ফ্লাস্কে জল ছিল। আর কোনও আসবাব ছিল না তাঁর। দরকারও ছিল না।

…মহেন্দর সিংয়ের ডোটাতে পেঁৗছে দেখা গেল, সেখানে কেউ নেই। একটি খোড়ো ঘর আছে শুধু। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। চারদিকে মাটির উঁচু বারান্দা। পূব দিকের বারান্দায় বেশ মজবুত গোছের একটি তক্তাপোশও রয়েছে। আর সামনের উঠোনে রয়েছে একটা কুয়া। আর কিছু নেই। অনেক দূরে মাঠে একটা ছোঁড়া ব'সে ঘাস কাটছে। ভুট্টা টিফিন-কেরিয়ারটি নাবিয়ে গেল তার কাছে। ভুবন সোম চৌকিটির উপর ব'সে পাইপটি ধরালেন। তাঁর মনে হ'ল, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে এ সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাওয়া শক্ত।

ভুট্টা ফিরে এসে বললে, মহেন্দর সিং এখানে নেই। নিজের গরুর গাড়িতে চেপে তিনি বারো ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে

বিবাহের ভোজ খেতে গেছেন। কবে ফিরবেন তা অনিশ্চিত। তাঁর কাম্‌তিও (চাকরের সর্দার) এখানে নেই। কিছুদিন পূর্বে গোয়ালাদের সঙ্গে ভুঁইহারদের যে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে তাতে আসামী হয়ে হাজত বাস করছে সে। অন্যান্য চাকরবাকরও সেই কারণে পলাতক, কারণ পুলিস দেখলেই গ্রেফতার করবে। ভুট্টা বললে, ভোজ খাবার ছুতোয় মহেন্দর সিংও সম্ভবত এই কারণেই সরেছেন। যে ঘাস কাটছে তার নাম ভাগিয়া। সে যদিও মহেন্দর সিংয়ের চাকর নয়, তবু সে-ই এখন এখানকার রক্ষক, কারণ তার ফুফাই (পিসে) মহেন্দর সিংয়ের কাম্‌তি। ভুট্টাকে সে আশ্বাস দিয়েছে যে, বাবুর যদি কিছু দরকার হয় এবং তা যদি তার সাধ্যাতীত না হয় তা হ'লে সে তা নিশ্চয়ই ক'রে দেবে। ভাগিয়ার কাছ থেকে আর একটি সাংঘাতিক খবরও ভুট্টা নিয়ে এল। আর একদল শিকারী নাকি খুব ভোরে নৌকো ক'রে এসেছে। খবরটি শুনে দ'মে গেলেন ভুবন সোম। মনে মনে বললেন, তা হ'লে মা-গঙ্গাকে প্রণাম ক'রে এখান থেকে ফিরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু ফিরবারও উপায় নেই, মোষ দুটি পালিয়েছে।

'তোর মোষ দুটোকে ধ'রে আনতে কত সময় লাগবে?'

'ওকরো কি কুছু ঠিক ছে! কাঁহা পর ভাগলোছে, খোজৈলো পড়তে।'

'দেখ্, যত শিগগির পারিস খুঁজে আন্। আমি একটু ঘুরে ফিরে দেখি ততক্ষণ পাই যদি কিছু।'

ভুবন সোম দেখলেন, ভুট্টা চাকরটি সত্যিই ভাল লোক। যাওয়ার আগে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কুয়া থেকে এক কলসী জল তুলে দিয়ে গেল। জল তোলবার জন্যে কুয়ার ধারেই বাঁশের তৈরী লাট ছিল এবং তাতে বাঁধা ছিল একটা লোহার কলসী। যাওয়ার

আগে ব'লে গেল যে, মোষ দুটোকে খুঁজে সে ওই শিমুলগাছের পশ্চিম দিকে ভগগু মোড়লের যে বাড়ি আছে সেখানেই থাকবে। ভগগু মোড়লের গোয়ালে মোষ দুটোকে বেঁধে রেখে তারপর এখানে আসবে। কারণ বিহনিয়ার এলাকায় ওদের আর নিয়ে আসা নিরাপদ নয়। মনে হচ্ছে ওই শিমুলগাছটাই সম্ভবত ওর এলাকার খুঁটি অর্থাৎ সীমাচিহ্ন। এই প্রসঙ্গে সে একটি কৌতুকজনক খবর দিলে। বললে, প্রথম মোষটা যে জোয়াল ফেলে পালিয়েছিল তার কারণ, সে বুঝতে পেরেছিল যে সে অন্য একটা বিহনিয়ার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেছে। বিহনিয়ারা গোবর দিয়ে নিজেদের এলাকা চিহ্নিত ক'রে রাখে। সেই গোবর দেখে কিংবা সেই গোবরের গন্ধ পেয়ে অন্য মোষেরা বুঝতে পারে যে, তারা শত্রুর এলাকায় পদার্পণ করেছে, আর বেশী দূর অগ্রসর হ'লে যুদ্ধ অনিবার্য। ভুবন সোমের আবার মনে হ'ল, কত জিনিসই যে জানি না। ভুট্টা চ'লে যাওয়ার আগে খেয়েও নিলেন তিনি। টিফিন-কেরিয়ার খুলে কিন্তু চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল তাঁর। এ-হে-হে-হে, এ কি করেছে অনিল, ডিমের ওমলেট আর আমের আচার দিয়েছে! দুটো জিনিসই যে অযাত্রা, তাই এই সব কাণ্ড হচ্ছে। খেলেন তবু। কয়েকখানা লুচি আর গোটা চারেক সন্দেশও ছিল। তাঁর ক্ষিধে পায় নি তেমন, তবু কাজটা মিটিয়ে ফেললেন। তা ছাড়া আর একটা কথাও তাঁর মনে হ'ল, এই টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে কত ঘুরবেন তিনি! এখানে রেখে যাওয়াও নিরাপদ নয়। ওই ভাগিয়া বিশ্বাসযোগ্য কি না কে জানে! খুব সম্ভবত নয়। ভুট্টা টিফিন-কেরিয়ারটা ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে তাঁর জলের ফ্লাস্কে জল ভ'রে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। ভুবন সোমের মনে হ'ল, এই ফ্লাস্কটা কাঁধে

ক'রে বেড়ানোও এক ঝঞ্ঝাট। শীতকালে জল তেষ্টা পাবে না। যদি পায়, পাশেই তো গঙ্গা। ফ্লাস্কটাও দিয়ে দিলেন তাকে।

...ভুট্টা চ'লে গেলে ভুবন সোম পাইপটি ধরালেন। সামনের দিকে চেয়ে ব'লে উঠলেন, 'বা বা বা বা!' পূর্বদিগন্তে রঙের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একরাশ মেঘ জমেছিল সেখানে, খেলাটা আরও জ'মে উঠেছিল তাই। সূর্য চক্রবালরেখা ছাড়িয়ে উঠি উঠি করছেন, উঠেছেন হয়তো, কিন্তু মেঘের ভিড় ঠেলে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি এখনও। কিন্তু সূর্যকে রুখবে কে! ভুবন সোম পাইপে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে উপভোগ করছিলেন দৃশ্যটা। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ যেখানে গিয়ে আকাশে মিশেছে ঠিক সেইখান থেকে শুরু হয়েছে লাল রঙের খেলা। চক্রবালরেখার গাছগুলো মনে হচ্ছে যেন কালি দিয়ে আঁকা। তারপরে লাল। এক রকম লাল নয়, নানা রকম লাল। লালের সীমা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে নীল—উজ্জ্বল নীল।

ভুবন সোম এককালে ছবি আঁকতেন, রঙের এই খেলা খুবই ভাল লাগছিল তাঁর। একটা রঙ আর একটা রঙের সঙ্গে কেমন বেমালুম মিশে গেছে, একটু গরমিল নেই, এতটুকু ছন্দপতন নেই।

আবার মনে পড়ল গার্ড মিস্টার ব্রাউনের কথা। মাঝে মাঝে মদ খেয়ে খুব উঁচুদরের কথা বলত সে। তাঁর মুখের সামনে হাত নেড়ে একদিন বলেছিল, 'বাবু, যদি রঙের খেলায় ভালভাবে মেতে যেতে পার, তা হ'লে ভগবানকে পাবে। চার্চেও যেতে হবে না, মন্দিরেও যেতে হবে না। কলার ইজ গড—বর্ণই ব্রহ্ম।' তিনি হিন্দুর ছেলে 'শব্দব্রহ্ম' কথাটা শুনেছিলেন। কিন্তু বর্ণও যে ব্রহ্ম—

এ কথা মিস্টার ব্রাউনই বলেছিল তাঁকে। ব্রাউন সাহেবের চেহারাটা আবার ভেসে উঠল মনে, খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। বড় বড় নীলচে চোখ দুটো সর্বদাই জলভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। চোখের নীচের দিকটা ছিল ফোলা-ফোলা। মাথায় অবিন্যস্ত রেশমের মত চুল। টুকটুকে গাল দুটিতে জরার চিহ্ন, খুব সরু সরু শিরাও দেখা যেত গালে। ড্যাবডেবে চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে যেদিকে চেয়ে থাকত, চেয়েই থাকত—চোখের পলক পড়ত না। চোখের নীচের পাতার কোলে টলটল করত জল। হাত নেড়ে কথা কইত, হাতের আঙুলগুলো কাঁপত, ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমার পাব দুটোতে বাদামী রঙের ছোপ ধ'রে গিয়েছিল ক্রমাগত সিগারেট খাওয়ার জন্য। ব্রাউন বলেছিল, বর্ণ ই ব্রহ্ম।

হঠাৎ মনে পড়ল নাতনী রেবাকে। সে তাঁকে রবি ঠাকুরের একটা গান শুনিয়েছিল একবার—'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে। ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয় পর পর তবে'। 'ওটা বাজে কথা, সবার রঙে রঙ মেশানো যায় না'—হঠাৎ ব'লে উঠলেন ভুবন সোম। নাতনী রেবার কথাটা কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। অনেক দিন তাদের খবর পান নি। একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে না। লিখবে কেন, দরকার তো আর নেই। মনে পড়ল রেবার একটা চোখ বসন্ত হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ওই কানা মেয়ের আর বিয়ে হবে না। তাই ওর বাপ-মা গান-বাজনা শেখাচ্ছে ওকে, ভাবছে কিছু একটা অবলম্বন হবে তবু। কিন্তু ভুবন সোম জানেন, হবে না। স্ত্রীলোকের অবলম্বন পুরুষ, পুরুষের অবলম্বন স্ত্রীলোক, এ ছাড়া অন্য রকম কিছু হয় না, হতে পারে না। হ'লেই গড়বড়। বিদ্যাসাগরের মত লোক তাই বিধবাদেরও বিয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকেছিলেন।

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালেন ভুবন সোম। দুম দুম ক'রে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল যেন কোথায়।

'এঃ, পাখীগুলো সব উড়িয়ে দেবে দেখছি—'

বন্দুকটা কাঁধে তুলে এগিয়ে গেলেন। যেখানে ভাগিয়া ব'সে ছোঁড়াটা ঘাস কাটছিল, সেখানে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, গঙ্গার চরে যাওয়ার রাস্তা কোন্ দিকে? ছোঁড়া কোনও জবাবই দিলে না। কালা নাকি! প্রথমে বাংলায় বলেছিলেন, এবার হিন্দিতে বললেন।

'গঙ্গাকা কিনারামে যানে কা রাস্তা কি ধর?'

ভাগিয়া নীরব।

আপন মনে ঘাসই কেটে যাচ্ছে তাঁর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে।

'আ মোলো। বাত কাহে নেই বোল্‌তা হ্যায়?'

ভাগিয়া ঘাড় তুলে তাঁর দিকে একবার চাইল কেবল, কোন জবাব দিল না।

'আরে, গঙ্গা কিনারামে যানে কা রাস্তা কি ধার বোল দেও না একটু।'

'রাস্তা নেই ছে।'

বলে কি! রাস্তা নেই! পুনরায় প্রশ্ন করলেন। আবার ভাগিয়া চুপ। আশ্চর্য ত্যাঁদড় ছোঁড়া! কিন্তু ভুবন সোমও নাছোড়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যেতে লাগলেন তিনি।

শেষে ছোঁড়া নিজস্ব ভাষায় যে জবাব দিলে তার সারমর্ম হচ্ছে, এখান থেকে গঙ্গার চরে যাবার কোনও রাস্তা নেই। যদি কেউ যেতে চায় তা হ'লে ওই অড়হরক্ষেতের ভিতর দিয়ে দিয়ে যেতে হবে। অড়হরক্ষেত পার হয়েও রাস্তা নেই, আছে গম আর যবের

ক্ষেত। তার সরু আল দিয়ে দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আর একটা অড়হরক্ষেত, সেটা পার হয়ে তবে গঙ্গার চর। গম আর যবের ক্ষেত সরু আলের উপর দিয়েই পার হতে হবে, কারণ ফসলে পা দিলে ক্ষেতের মালিক ভিখন গোপ লাঠি হাতে তেড়ে আসবে। সে ক্ষেতের এক প্রান্তে একটা ঝোপড়ির মধ্যে ঘাপটি মেরে ব'সে আছে। আর বাবু যদি রাস্তা দিয়ে যেতে চান তা হ'লে যে শিমুল-গাছটার কাছে বিহনিয়া তাঁদের আক্রমণ করেছিল সেইখানে ফিরে যেতে হবে। সেখান থেকে যে রাস্তা পূর্ব দিকে চ'লে গেছে সেই রাস্তা ধ'রে কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটি আমগাছ দেখা যাবে ডান দিকে, অনেক মুকুল হয়েছে তাতে। সেই আমগাছের পাশ দিয়ে গঙ্গার চরে যাওয়ার রাস্তা।

ভুবন সোম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ভুট্টা তাঁকে এই রকম একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়ে স'রে পড়ল। 'উফ!'—ব'লে চুপ ক'রে গেলেন তিনি। পর-মুহূর্তেই তাঁর মনে হ'ল, তিনি ভদ্রলোক, সুতরাং অসহায়। এদেরই আজকাল বাড়বাড়ন্ত, এরা যা খুশী ক'রে যাবে, মুখটি বুজে সহ্য করতে হবে। এতদূর যখন এসে পড়া গেছে তখন গঙ্গার চরে পেঁছিতেই হবে। এই ছোঁড়াটাকেই একটু তোয়াজ করা যাক। কিন্তু কি করলে যে এই ঘেঁচি-মার্কা বিচ্ছু খুশী হবে তাও তো জানা নেই। একটু ভাবলেন। তারপর কলিকালে যে মন্ত্র পাঠ করলে সব দেবতাই তুষ্ট হন সেই মন্ত্রটিই ঝাড়লেন শেষে।

সরল বাংলা ভাষায় বললেন, 'আমাকে গঙ্গার ধারে পৌঁছে দে বাবা, তোকে বকশিশ দেব। আচ্ছা, আগামই না হয় নে কিছু।'

মনি-ব্যাগটি বার ক'রে একটি দোয়ানি দিলেন তাকে। ভাগিয়া দোয়ানিটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে কানের পাতায় আটকে রেখে

দিলে। চৌকো দোয়ানিটি তার কানে ঠিক ফিট্ ক'রেও গেল। ভুবন সোম দেখলেন, কানে একটা বিড়িও গোঁজা রয়েছে। ছোঁড়া কিন্তু ওঠবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করলে না। যেমন ঘাস কাটছিল তেমনি কাটতে লাগল।

'কি রে, ছু আনা পছন্দ হ'ল না বুঝি ? আচ্ছা, আরও ছু আনা নে। ওঠ্ এইবার, আমাকে পৌঁছে দে বাবা।'

মনি-ব্যাগ বার ক'রে খুঁজে-পেতে আর একটি চৌকো দোয়ানি দিলেন তাকে। নিমেষের মধ্যে সেটাও সে আর একটা কানে ফিট্ ক'রে নির্বিকারভাবে ঘাস কাটতে লাগল। রাগে সমস্ত শরীর রি-রি ক'রে উঠল ভুবন সোমের। কিন্তু তখনই মনে হ'ল, রেগে বেসামাল হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিট খানেক।

নীরবতায় ফল হ'ল। ভাগিয়া ঘাসের বোঝাটা বেঁধে ফেললে, তারপর তার উপরে চ'ড়ে দমক দিলে ছু-চারবার। আবার মনোমত ক'রে বাঁধলে, তারপর কাস্তেটা তাতে গুঁজে দিলে। এর পর সে যা করলে তা একেবারে নাটকীয়। একটি পাঁচ টাকার নোট সে বাড়িয়ে দিলে ভুবন সোমের দিকে। নিজস্ব ভাষায় বললে, বাবু যখন ব্যাগ খুলে দোয়ানি বার করছিলেন তখনই নোটটা ঘাসের উপর প'ড়ে গিয়েছিল, সে এতক্ষণ ঘাস চাপা দিয়ে ছিপিয়ে (লুকিয়ে) রেখে মজা দেখছিল। চোখের পাতা ছুটো মিট্‌মিট্ করতে লাগল তার। একটু হাসল না কিন্তু। নীরবে এবং অবলীলাক্রমে প্রকাণ্ড ঘাসের বোঝাটা মাথায় তুলে ডোটার দিকে চলতে লাগল।

ছোঁড়ার কাণ্ড দেখে ভুবন সোম থ হয়ে গিয়েছিলেন। অনুসরণ করতে লাগলেন তিনি তাকে।

ডোটায় পৌঁছে ঘাসের বোঝাটা একটা ঘরে রেখে, ঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে সে বললে, 'অব চলিয়ে বাবু।'

ভুবন সোম চমৎকৃত হয়ে গেলেন। হাতের কাজটি সেরে তবে অন্য দিকে মন দিলে। পয়সা দিয়েও ওকে বিচলিত করা গেল না। পয়সার প্রতি ওর লোভই নেই সম্ভবত, থাকলে পাঁচ টাকার নোটটা ফেরত দেয়! এ রকম দেখেন নি তিনি কখনও। তাঁর ভাগ্নে হন্নুর কথা মনে পড়ল।

ভাগিয়া যেখানে ব'সে ঘাস কাটছিল সেইখানেই এক ছুটে চ'লে গেল আবার। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তাঁর দিকে, তারপর অড়রক্ষেতে ঢুকে পড়ল। ভুবন সোমের পক্ষে ওর মত ছুটে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তবু যতটা সম্ভব দ্রুতবেগে গিয়ে হাজির হলেন তিনি অড়রক্ষেতের ধারে। অড়রক্ষেতের ভিতর প্রবেশ করা কিন্তু কঠিন হ'ল তাঁর পক্ষে। বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে তো ঢুকতেই পারলেন না, হাতে ঝুলিয়ে নিলেন সেটা, তারপর অতিকষ্টে ঢুকলেন। ঢুকে ভাগিয়াকে দেখতে পেলেন না। কোথায় গেল ছোঁড়া?

'ভাগিয়া, কোথা গেলি?'

'আবো নি ইধর।'

তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ ক'রে এগুলেন খানিকটা। সোলার হ্যাটটা মাথা থেকে বার বার প'ড়ে যেতে লাগল, আর বন্দুকটাও আটকে আটকে যেতে লাগল অড়রের গাছে। হ্যাটটা শেষে বগলদাবা করলেন।

'ভাগিয়া—'

'হাঁ, ইধর ছি—ইধর ছি।'

অড়রক্ষেতের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গায় ভাগিয়া দাঁড়িয়ে আছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। অড়রগাছের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা উঠোন যেন। নিতান্ত ছোটও তো নয়। একটা কুঁড়েঘরও রয়েছে এক ধারে। ভাগিয়ার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতে ভাগিয়া বললে, এটা তার নিজের ক্ষেত, ওই কুঁড়েঘরে থেকে ক্ষেত পাহারা দেয় সে। রাত্তিরেও শোয়। ভুবন সোম দেখলেন, ভাগিয়ার শখও আছে। একটি ছোট খাঁচায় একটি বুনো খরগোশের বাচ্চাও পুষেছে সে। ক্ষেতের ধার থেকে কিছু দূর্বাঘাস ছিঁড়ে খরগোশের খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ভুবন সোমের দিকে চেয়ে সে বললে, 'অব চলিয়ে—'

'খরগোশ কোথা পেলি ?'

ভাগিয়া সগর্বে জানালে খরগোশটা সে ধরেছে, ছুটে ধরেছে।

'খালি ঘাস খায় ?'

'তুধ ভি খাইছে। বুট ভি—'

বাক্যালাপ ক'রে বেশী সময় নষ্ট করতে চাইল না সে। আবার ঢুকে পড়ল অড়রক্ষেতে। তর্ তর্ ক'রে চলতে লাগল অড়রক্ষেতের ভিতর দিয়ে, যেন তার ঘর বাড়ি এসব। ভুবন সোম নিজের বাড়ির পাকা দালানেও এত স্বচ্ছন্দে চলতে পারেন না। ওটাও মানুষ নয়, যেন খরগোশ। ছুটে চলেছে ব্যাটা। ভুবন সোমকেও বাধ্য হয়ে গতিবেগ বাড়াতে হ'ল। যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে। পাল্লা দেওয়া কি সোজা এই অড়রবনের মাঝখানে !

মিনিট পাঁচেক এ তুর্ভোগ ভুগতে হ'ল। অড়রক্ষেত পার হয়ে যব আর গমের ক্ষেতে এসে পড়লেন। বেশ বড় ক্ষেত এটা। এরও এক প্রান্তে ছোট একটি কুঁড়েঘর রয়েছে, আর সেই কুঁড়ের

ভিতর ব'সে আছে ক্ষেতের মালিক ভিখন গোপ—এর কথা একটু আগেই ভাগিয়া বলেছিল। চেহারাটা ভীষণই সত্যি। কুচকুচে কালো এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, সমস্ত মুখটি গোঁফে-দাড়িতে ঢাকা, প্রায় চোখ পর্যন্ত ঢাকা, নাকের ছিদ্র পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না—আর সে কি সাধারণ দাড়ি, জটিল দাড়ি। ভুবন সোম ভাগিয়ার নির্দেশমত আলের উপর দিয়েই সন্তর্পণে এগুচ্ছিলেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড ঘটল। ভিখন গোপ কুঁড়ে থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে খুব ঝুঁকে সেলাম করলে তাঁকে, তারপর সঙ্কুচিতভাবে একটু হাসলে। ভুবন সোম দেখলেন, লোকটি শৌখিন, সামনের দুটি দাঁতের মাঝখানে সোনার ছোট ছোট বিন্দু।

ভিখন যদি আসে মারমুখী হয়ে আসবে, এইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন ভুবন সোম। এই অতিবিনীত বশম্বদ ভিখনের মুখের দিকে চেয়ে একটু কৌতুক বোধ করলেন তিনি। সম্ভবত তাঁর সাহেবী পোশাকের দরুনই এটা ঘটল। ভিখন গোপকে নরম হতে দেখে ভাগিয়া একটু পুলকিত হ'ল যেন। সাহেব যে এখানে এসেছেন এটা যেন তারই কৃতিত্ব। নিজেদের ছিকা-ছেনি ভাষায় তারপর সে ভিখন গোপকে বললে, সাহেব কেন এসেছেন। শুনে ভিখন গোপ যেন কৃতার্থ হয়ে গেল, বললে, ঘাটে একটা নৌকো লাগানো আছে, তার নিজের নৌকো, সাহেব যদি সেটা ব্যবহার করেন সে নিজেকে ধন্য মনে করবে।

'মাঝি-টাঝি আছে ?'

'ভাগিয়া লে যৈতে।'

'ভাগিয়া নৌকো বাইতে পারবে ?'

ভাগিয়া ঘাড়টা খুব বেশীরকম কাত ক'রে জানালে, খুব পারবে।

সরু আলের উপর পা ফেলে ফেলে চলতে ভুবন সোমের কষ্ট হচ্ছিল। এ দেখে ভিখন গোপ কখনও যা করে না তাই করলে। বললে, আপনি ক্ষেতের উপর দিয়ে ফসল মাড়িয়েই যান, দু-চারটে গাছ মরলে কি আর এমন ক্ষতি হবে!

ভাগিয়া অবাক হ'ল। এ রকমটা সে দেখে নি আগে, ভাবতেও পারে নি।

যব গমের ক্ষেত পার হয়ে আর একটি অড়রক্ষেত, তবে এটি ছোট। পার হতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না। অড়রক্ষেত থেকে বেরিয়েই জল দেখা গেল। গঙ্গার ধারা নয়, খানিকটা বানের জল দু পাশের উঁচু বালিয়াড়ির মধ্যে আটকে পড়েছিল বর্ষাকালে, এখনও শুকিয়ে যায় নি। তার ধারে পৌঁছুতেই এক ঝাঁক খঞ্জন উড়ে গেল। উড়ে গিয়ে একটু দূরে ব'সে ল্যাজ দোলাতে লাগল। তার মধ্যে কতকগুলো হলদে খঞ্জন দেখে অবাক হলেন ভুবন সোম। আগে দেখেন নি। খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তাদের দিকে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল।

'উ সব ধোবিন্ ছে।'

'ধোবিন্? না, খঞ্জন।'

'নেই, ধোবিন্।'

ভুবন সোম বুঝলেন, খঞ্জনকে এরা ধোবিন্ বলে।

'নাও কাঁহা?'

'আবোনি।'

কিছুদূর বালির চড়া ভেঙে আসল গঙ্গার তীরে যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন সূর্য উঠে গেছে।

আবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। হাঁসের ডাকও শুনতে পেলেন। দেখতেও পেলেন অনেক দূরে একদল হাঁস উড়ছে।

'ফট্‌ফটিয়া নাও পর সাহেবলোগ আইলোছে—'

'ফট্‌ফটিয়া নাও' মানে মোটর-বোট। মোটর-বোটে ক'রে কে এল আবার? ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মিনিস্টারদের কেউ বোধ হয়। এঁরা আবার মহাত্মা গান্ধীকে রাষ্ট্রপিতা বানিয়েছেন!

খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি উড়ন্ত হাঁসগুলোর দিকে। মারতে পারবেন তো সাড়ে বাইশ, মাঝ থেকে পাখীগুলোকে ভড়কে দিয়ে গেলেন!

দেখা গেল, মোটর-বোটটা ওপার ঘেঁষে চ'লে যাচ্ছে।

'সাহেবলোগ অব ইধর নেহি আইতে—'

ভিখন গোপের নৌকোটা একটু দূরে বাঁধা ছিল। তাতে উঠবেন কি না প্রথমটা ইতস্তত করতে লাগলেন ভুবন সোম। এই ছোঁড়াটার ভরসায় ওঠাটা কি উচিত হবে? ভাগিয়া তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সম্ভবত তাঁর মনের কথাটা টের পেয়ে গেল। বললে, লগগি ঠেলে ঠেলে সে ধারে ধারে নিয়ে যাবে, ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিছুদূর গেলেই হাঁসও পাওয়া যাবে।

দুর্গা ব'লে উঠলেন শেষে। ও বাবা, এ যে দুলছে খুব! নৌকো ক'রে তিনি পাখী শিকার করেন নি কখনও, পায়ে হেঁটেই করেছেন বরাবর। নৌকোয় দাঁড়িয়ে 'এম' (aim) ঠিক হবে কি না কে জানে! স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ—কথাটা মনে পড়ল।

তারপর মনে পড়ল টুনটুনি পাদরিকে।
সেই প্রথমে বলেছিল কথাটা।

…ভাগিয়া লগি ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ভুবন সোম অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। টুনটুনি পাদরির কথাই ভাবতে লাগলেন।

প্রভাতের সূর্যকিরণে গঙ্গার প্রতিটি তরঙ্গশীর্ষে সোনা চকমক করছিল। সেদিকে চেয়ে চেয়ে আবার টুনটুনি পাদরির চেহারাটা মনে ফুটে উঠল।

সিগার ধরালেন। টুনটুনি পাদরির চেহারা কুৎসিত ছিল। কালো, বেঁটে, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় পাদরির টুপি, পরনে পাদরির আলখাল্লা। লোকটা খুব উপকার করেছিল তাঁর। সে-ই যোগাড়-যন্ত্র ক'রে রেভারেণ্ড ফার্গুসনকে দিয়ে এজেণ্টের কাছে চিঠি লিখিয়েছিল একটা। আর তারপর থেকেই তাঁর ডবল প্রমোশন হয়ে গেল। এজেণ্টের নেক্‌নজর থাকলে কার সাধ্য আটকায়? ওরাই সে যুগে দেবতা ছিল, অনুগ্রহ করলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারত।…টুনটুনি পাদরির কাছে সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ তিনি। অথচ দেখা হয়েছিল হঠাৎ, আলাপও যৎসামান্য। প্রথম আলাপ ওয়েটিংরুমে। তারপর একদিন টুনটুনি পাদরি তাঁর বাসায় এসে হাজির। বললেন, কোন একটা গ্রামে একজন রোগীর খবর নিতে গিয়েছিলেন। ট্রেনের এখনও অনেক দেরি আছে দেখে তাঁর খবরটাও নিতে এসেছেন। সেদিন রবিবার, কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল তিনি খান নি কিছু, কাছে-পিঠে কোনও হোটেল আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'কেলনারে খেতে অনেক খরচ, শস্তা হোটেল পেলে সেইখানেই যেতাম।'

ভুবন সোমের তখনও খাওয়া হয় নি, তিনি তাঁকে তাঁর সঙ্গেই খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। প্রথমে রাজী হন নি তিনি, অনেক অনুরোধ করার পর শেষে রাজী হলেন। বললেন, 'আচ্ছা, তা হ'লে এই বারান্দায় একটা কলাপাতায় ক'রে সামান্য কিছু এনে দিন। হিন্দুর বাড়িতে খ্রীষ্টানকে খাওয়ানো এক ল্যাটা তো।' ভুবন সোম বললেন, 'সে কি কথা! আমরা দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি ব'সে খাব। ওসব গোঁড়ামি আমাদের নেই। আমাদের কাছে অতিথি দেবতা।' এতেই কৃতার্থ হয়ে গেলেন টুনটুনি পাদরি। তিনি খুব যে হৈ-হৈ খাতির করেছিলেন তাও নয়, খাওয়াদাওয়াও অতি সাধারণ ছিল—সেদিন মাছ পর্যন্ত কেনা হয় নি। খাওয়াদাওয়ার পর টুনটুনি পাদরি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন বারান্দার চেয়ারটায়। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কত কথাই মনে পড়ছে!' ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'কি কথা?' টুনটুনি পাদরি বললেন, 'নিজের অতীত জীবনের কথা। আমি এককালে নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলাম, বিশ্বাস হয় এখন? আমাদের প্রসাদ পাবার জন্যে, পাদোদক নেবার জন্যে বাড়িতে ভিড় ক'রে লোক আসত।' কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ভুবন সোম। তাঁর ধারণা ছিল, সাধারণত নীচ জাতের লোকেরাই খ্রীষ্টান হয় চাকরির লোভে। ব্রাহ্মণের ছেলে হতে গেল কেন? প্রেমে-ট্রেমে পড়েছিল নাকি? কথাটা জিগ্যেস করেছিলেন তিনি টুনটুনি পাদরিকে। উত্তরে টুনটুনি পাদরি যা বলেছিলেন তা আরও আশ্চর্যজনক। ভাল ক'রে লিখলে একখানা উপন্যাস হয়। গল্পটা আগাগোড়া এখনও মনে আছে তাঁর।

বলেছিলেন, তিনি একবার পাড়ার একটি ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে যাচ্ছিলেন। গরুর গাড়ি ক'রে যাচ্ছিলেন তাঁরা। চার-পাঁচটা গরুর গাড়ি সার বেঁধে চলছিল। তখন ঘোর গ্রীষ্মকাল, জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। কিছুদূর যাবার পর গরমের জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, গা গুলিয়ে উঠল তাঁর, তিনি বমি ক'রে ফেললেন। কিছুদূর যাবার পর আবার বমি হ'ল এবং তারপরই পেট ভাঙল। জলের মত পায়খানা হ'ল বার কয়েক। কারও বুঝতে বাকি রইল না যে, কলেরা হয়েছে। কলেরা-রোগীকে নিয়ে বিয়ে-বাড়িতে যাওয়া চলে না। তাই তাঁকে তাঁরা একটা গাছতলায় নামিয়ে রেখে চ'লে গেল। দু-একজন থাকলে পারত, কিন্তু কেউ রইল না। একজনও যদি থাকত, তা হ'লে তাঁর জীবনের কাহিনী অন্যরকম হ'ত আজ। কিন্তু কেউ রইল না। সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে সেই জনহীন মাঠে একা গাছতলায় প'ড়ে তিনি রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু জল দেবে কে! খানিকক্ষণ পরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি। কতক্ষণ এভাবে প'ড়ে ছিলেন তা তিনি জানেন না। খানিকক্ষণ পরে অনুভব করলেন, কে যেন তাঁকে কাঁধে ক'রে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সর্বাঙ্গ বমি আর বিষ্ঠায় মাখামাখি। কে তাঁকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে! যমদূত না কি! খানিকক্ষণ পরে বুঝতে পারলেন যমদূত নয়, দেবদূত। দীর্ঘকান্তি বলিষ্ঠ ঋজুদেহ সাহেব একজন, ক্রিশ্চান মিশনারি। তিনি তাঁকে একটা হাসপাতালে নিয়ে এলেন, তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করলেন, রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন, এক কথায় তাঁর পুনর্জন্ম দিলেন। ভাল হয়ে আর তিনি বাড়ি ফিরে যান নি। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেছিলেন। গত বিশ

বৎসর ধ'রে এই কাজ করছেন তিনি। পায়ে হেঁটে বহু গ্রামে গ্রামে পর্যটন ক'রে বহু নরনারীকে খ্রীষ্টান করবার চেষ্টা করেছেন তিনি। সফলও হয়েছেন।

নিজের কাহিনী শেষ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন টুনটুনি পাদরি। আস্তে আস্তে পা দোলাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ ভুবন সোমের দিকে ফিরে তিনি যা বললেন তা এত অপ্রত্যাশিত যে, ভুবন সোমের মনের রঙই বদলে গেল। কারণ ভুবন সোম মুখে যদিও ভদ্রতার চূড়ান্ত করেছিলেন, কিন্তু মনে মনে নাক কুঁচকে বসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব বা স্বামী বিবেকানন্দ যাই বলুন, ইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টানের উপর শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর। কিন্তু টুনটুনি পাদরি এবার যা বললেন তাতে চমকে উঠতে হ'ল তাঁকে।

বললেন, 'আচ্ছা মশাই, এখন যদি আমি শুদ্ধি ক'রে আবার হিন্দু হই, আপনারা আমাকে আবার ফিরে নেবেন ?'

ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'ও-কথা বলছেন কেন ?'

টুনটুনি পাদরি আবার চুপ ক'রে গেলেন, দাড়ির ভিতর আঙুল চালাতে লাগলেন। তারপরে বললেন, 'বলছি, কারণ এখন আমি আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি। যারা আমাকে গাছতলায় ফেলে পালিয়েছিল তারা ভীরু, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কিন্তু নীচ নয়। তাদের এই অধঃপতনের জন্যে তারা দায়ীও নয়, দায়ী সুদীর্ঘ পরাধীনতা। ইংরেজরা আমাদের শুধু কেরানী করতে চেয়েছিল, সত্যিকার মানুষ করতে চায় নি। বরং যাতে আমরা অমানুষ হয়ে চিরকাল ওদের গোলামি করতে থাকি সেই চেষ্টাই করেছিল ওরা। নিজে যখন খ্রীষ্টান হলাম, ওদের সঙ্গে ভাল ক'রে মেশবার সুযোগ পেলাম তখন বুঝলাম, আমাদের ওরা কি চোখে দেখে! সাম্য

ওদের মুখের বুলি, আমাদের ওরা উপকার করে খ্রীষ্টধর্ম আর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রচার করবে ব'লে, কিন্তু মনে মনে ওরা আমাদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। ওদের নীচতা দেখে অবাক হয়ে গেছি। ম'রে গেলেও ওদের সঙ্গে এক কবরখানায় স্থান হয় না আমাদের। আপনি যত কাজের লোকই হোন, যত বড় বিদ্বানই হোন, সাহেবদের নীচে আপনার স্থান। আমি ওদের জন্যে যত কাজ করেছি তাতে আমি এতদিন বিশপ হয়ে যেতাম, হই নি কারণ আমার চামড়ার রঙ কালো। দু-একটা ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এ দেশের লোক অধঃপতিত, তার কারণ এরা বহুকাল ধ'রে পরাধীন, বহুকাল ধ'রে অশিক্ষিত। কিন্তু এরা সভ্যতা-অভিমানী হয়েও আমাদের সম্পর্কে কতটা যে নীচ তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। আমি ভাবি, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্যে যে পরিশ্রমটা করেছি, এ দেশের অজ্ঞতা দূর করবার জন্যে তার সিকির সিকিও যদি করতাম তা হ'লে খুব বড় কাজ হ'ত। এখন এসব করবার সুবিধা নেই অবশ্য। এখন স্বদেশহিতৈষী ভাল লোককে ওরা জেলে পুরে রাখে, দ্বীপান্তরে পাঠায়, ফাঁসি দেয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবে, হবেই একদিন, তাই ভাবছি এইবার যদি—'

এই পর্যন্ত ব'লে থেমে গেলেন টুনটুনি পাদরি। ভুবন সোম দেখলেন তাঁর চোখের কোণে জল টলমল করছে। সাহেবদের হয়ে একটা উত্তর দিতে পারতেন তিনি, কিন্তু চোখের কোণে জল দেখে আর কিছু বললেন না। টুনটুনি পাদরি চ'লে যাওয়ার মাস খানেক পরেই অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রমোশন হয়ে গেল তাঁর। খবর নিয়ে জানলেন স্বয়ং এজেন্টের কন্‌ফিডেন্‌শাল অর্ডারে এটা হয়েছে। এজেন্ট হঠাৎ তাঁর প্রতি সদয় হতে

গেলেন কেন, বুঝতে পারেন নি তিনি। মাস কয়েক পরে একদিন একটি সাঁওতাল ক্রিশ্চান এক টুকরি আম আর একটি চিঠি নিয়ে এল। চিঠি লিখেছেন রেভারেণ্ড ফার্গুসন। লিখেছেন যে, 'পাদরি এন্‌টনিও ঘোষালের প্রতি আপনি যে সদয় ব্যবহার করেছিলেন তার জন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। পাদরি এন্‌টনিও ঘোষালের ইচ্ছা ছিল আপনাকে এক টুকরি আম পাঠাবেন। তিনি বেঁচে থাকলে নিজেই যেতেন, কিন্তু হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর সে বাসনা অপূর্ণ র'য়ে গেল। তাঁর এ ইচ্ছার কথা আমি জানতাম, তাই জন কচ্ছপের মারফত আমগুলি আপনাকে পাঠাচ্ছি। গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব।'···আমগুলি অবশ্য খুব ভাল ছিল না, টোকো আঁটিসর্বস্ব পাহাড়ে আম। তবু কিন্তু টুনটুনি পাদরির ব্যবহারে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন ভুবন সোম। পরে তিনি খবর পান যে, রেভারেণ্ড ফার্গুসনের সঙ্গে তখনকার এজেণ্টের খুব দহরম-মহরম ছিল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, হঠাৎ তাঁর প্রমোশন হয়েছিল কেন। টুনটুনি পাদরিই কলকাঠিটি নেড়ে গিয়েছিলেন। টুনটুনি পাদরির কথা কিন্তু আর বেশীক্ষণ ভাবতে পারলেন না তিনি। ভাগিয়া আচমকা চিৎকার ক'রে উঠল।

'চিড়িয়া ছে বাবু, বড়কা চিড়িয়া—'

এই ব'লে সে ঝপাং ক'রে লাফিয়ে পড়ল জলে। ভুবন সোম দেখলেন, একটা মরা রাজহাঁস ভেসে যাচ্ছে। ভাগিয়া সেটাকে ধরবে ব'লে সাঁতরাতে লাগল। ভুবন সোম প্রথমে একটু অবাক হলেন, তারপর বুঝতে পারলেন। যারা মোটর-বোটে চ'ড়ে শিকার করতে এসেছিল তাদের গুলিতে রাজহাঁসটা মরেছে; কিন্তু

জলে পড়েছে, ওরা হয় দেখতে পায় নি কিংবা ধরতে পারে নি। ভাগিয়া প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছিল, ভুবন সোমও উত্তেজনা ভরে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এদিকে আর এক কাণ্ড হচ্ছিল সেটা প্রথমে খেয়াল করেন নি তিনি। নৌকোটা স্রোতে পড়েছিল আর দ্রুতবেগে স'রে যাচ্ছিল ভাগিয়ার কাছ থেকে। কি করা যায় এখন! ভুবন সোম চেষ্টা করলেন লগিটার সাহায্যে নিজেই যদি নৌকোটাকে তীরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। পারলেন না। টাল সামলাতে পারলেন না, আর একটু হ'লে জলে প'ড়ে যেতেন।

'ওরে ভাগিয়া, নাও ভাস্ যাতা হ্যায়।'

ভাগিয়া শুনতে পেলে কি না বুঝতে পারলেন না। এরা অনেক সময় শুনেও কালা সেজে থাকে। এদিকে মোটেই ফিরে চাইছে না, উন্মুখ হয়ে সাঁতরে চলেছে হাঁসটার দিকে। প্রায় মাঝ-গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। হাওয়ার বেগটাও বাড়ছে ক্রমশ।

'ওরে ভাগিয়া—এই ভাগিয়া—'

ফিরেও চাইলে না ভাগিয়া। সোজা সাঁতরে চলেছে। নৌকোটাও ক্রমশ মাঝগঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল। বেশ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। এ কি প্যাঁচে পড়লেন নৌকো চ'ড়ে! বেঘোরে প্রাণটা যাবে নাকি! হঠাৎ নজরে পড়ল, আরে, সর্বনাশ! নৌকোর তলা দিয়ে জল উঠছে যে! জল ছেঁচবার জন্যে একটা পাত্রও রয়েছে দেখতে পেলেন। ভুবন সোম আর কালবিলম্ব না ক'রে জল ছেঁচতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। রবিজন জুম্মোর

গল্পটা মনে প'ড়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখলেন, ভাগিয়াটা করছে কি। না, ফেরবার কোন লক্ষণ নেই। নৌকো তরতর ক'রে এগিয়ে চলল।

'ওরে ভাগিয়া—'

ডাক শুনতে পেয়েছে কি না এবারও বোঝা গেল না। হাঁসের দিকেই সাঁতরে চলেছে। যাক, হাঁসটাকে ধরেছে এবার। ফিরছে। হাঁসসুদ্ধ হাতটা তুলে তাঁকে দেখাল একবার। নৌকো কিন্তু দ্রুতবেগে ভেসে যাচ্ছে। কোথায় গিয়ে ঠেকবে ভগবানই জানেন। জলছেঁচা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তাই করতে লাগলেন ভুবন সোম। দামী গরম প্যাণ্টটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। নগদ পাঁচটি টাকা নেবে সুলেমান এটি পেট্রল দিয়ে কেচে পরিষ্কার ক'রে দিতে। ব্যাটা বার বার সেলাম করে, কিন্তু একটি পয়সা কমাতে চায় না।

হঠাৎ ভাগিয়া সাঁতার কাটতে কাটতে চিৎকার ক'রে উঠল—'নাও ভাস্‌লো যাইছে হো, দৌগো দৌগো,' আর ক্রমাগত চেঁচাতেই লাগল। মনে হ'ল কাকে যেন ডাকছে। এ তেপান্তর চরে কাছাকাছি কেউ আছে কি? দেখা গেল আছে। তেপান্তর চরেই তিন-চারজন ষণ্ডা গোছের লোক আবির্ভূত হ'ল। ছুটতে ছুটতে আসছে। সম্ভবত ওই অড়রক্ষেতের ভিতর কাজ করছিল ওরা। তাদের দেখে ভাগিয়া আরও চেঁচাতে লাগল। চারটে লোকই ঝপাং ঝপাং ক'রে লাফিয়ে পড়ল গঙ্গায়। নৌকো তখন অনেক দূর ভেসে গেছে। প্রায় মিনিট পনেরো সাঁতরে তারা নৌকোটাকে ধরলে এসে। হাঁসসুদ্ধ ভাগিয়াও এসে চড়ল।

ভুবন সোম দেখলেন, বেশ বড় 'পিন্‌টেল' একটা। তিনি চটেছিলেন খুব। ভাগিয়াকে জিগ্যেস করলেন, 'তুই আমার ডাক শুনতে পাস নি ?'

ভাগিয়া ঘাড় কাত ক'রে জানালে, পেয়েছিল।

'তবে ফিরে এলি না কেন ?'

এ শুনে ভাগিয়া একটু বিস্মিত হ'ল। বললে, হাঁসটাকে ধরবে ব'লে সে জলে লাফিয়ে পড়েছিল, সেটাকে না নিয়ে ফিরবে কি ক'রে !

তারপর বললে, 'তোরে বাস্তেই তো !' মুখের ভাবটা এমন করলে যেন, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর !

ভুবন সোম বললেন, 'ও-হাঁস আমি চাই না। আমি নিজে শিকার করব। ও-হাঁস তুই নিগে যা '

ভাগিয়ার মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল। আশা করেছিল, বাবু বাহবা দেবে।

একজন বললে, 'চল্, ঝরকাইকে খাইবো।'

ভাগিয়া হাঁসটা নৌকোর গলুইয়ের উপর রেখে দিলে।

'আরে খোক্‌না লেকে ভাগতো রে, নীচে রাখি দে।'

ভাগিয়া বিমর্ষ মুখে লগি ঠেলতে লাগল। হাঁসটার প্রতি আর দৃক্‌পাতও করলে না। ভুবন সোমের ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছিল বেচারা।

ভুবন সোম জিগ্যেস করলেন, 'খোক্‌না কি ?'

তারা বললে যে, খোক্‌না এক রকম বাজের মত বড় পাখী, মরা পাখী দেখলে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়। এই জন্যেই

শিকারীদের পিছু পিছু ঘোরে তারা অনেক সময়। একটা লোক হাঁসটাকে তুলে নৌকোর খোলের ভিতর রেখে দিলে। নৌকোতে দাঁড় ছিল। দাঁড় বাইতে লাগল ওরা।

'কিধর যাইবো বাবু?'

ভুবন সোম বললেন, নৌকোয় আর যাবেন না তিনি। একবার চ'ড়েই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

একটু পরে বালির চরায় ওঁকে নামিয়ে দিয়ে নৌকো বাইতে বাইতে চ'লে গেল ওরা।

ভুবন সোম হাঁটতে লাগলেন।

॥ পাঁচ ॥

ভুবন সোম কতক্ষণ যে হেঁটেছিলেন তা তাঁর খেয়াল ছিল না। তিন দিকে ধু-ধু করছে বালির চর, আর এক দিকে গঙ্গা। বালির চর কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও বা সমতল। কোথাও কোথাও এত উঁচু যে মনে হয়, ছোটখাটো পাহাড় এক-একটা, ওপারে কি আছে দেখা যায় না। কিছুক্ষণ হেঁটে ভুবন সোম বেশ চন্‌মনে হয়ে উঠলেন, তাঁর যৌবন ফিরে এল যেন, সোৎসাহে তিনি বালির উঁচু টিলাগুলোর উপরও উঠতে লাগলেন। উঠে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন, পাখী কোথাও আছে কি না। যতদূর দেখা গেল, পাখীর চিহ্ন নেই, ডাকও শুনতে পেলেন না। ওই ফট্‌ফটিয়া নৌকোই সর্বনাশ ক'রে গেছে। এক-একটা টিলায় ওঠেন, আবার টিলা থেকে নেবে হাঁটতে থাকেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটল। চরে শুধু বালি নেই, মাঝে মাঝে গাছও আছে, বেশীর ভাগই ঝাউগাছ। ঝাউগাছে বাদামী রঙের অচেনা ছোট ছোট পাখী, চড়ুই পাখীর মত, কিন্তু ল্যাজটা খুব লম্বা—যেন সামলাতে পারছে না। ডাকটা খুব মিষ্টি। আর ক্রমাগত ডাকছে, এক দণ্ড সুস্থির হয়ে বসছে না কোথাও। এক ঝাউগাছ থেকে আর এক ঝাউগাছে উড়ে উড়ে বসছে, ব'সেই আবার উড়ছে। এ পাখী চেনেন না ভুবন সোম, প্রথমে ভেবেছিলেন 'বগেরি' বুঝি; কিন্তু দেখলেন তা নয়, এ অন্য পাখী। সেই বাইনাকুলারওলা ছোকরা থাকলে ল্যাটিন নাম বলতে পারত সম্ভবত। হাঁটতে হাঁটতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করলেন ভুবন সোম। এই জনমানবহীন বালির চরেও কাক শালিক নীলকণ্ঠ আর ফিঙে

প্রচুর রয়েছে। একটু দূরে গোদাচিলও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা। দু-তিন রকম মাছরাঙা পাখীও চোখে পড়ল। একটা ছোট্ট মাছরাঙা অদ্ভুত, ঠিক যেন রঙিন প্রজাপতির মত। বাটানও দেখতে পেলেন কয়েক জোড়া। এদের চেনেন তিনি। মনে পড়ল, একবার বাটান মেরেছিলেন, কিন্তু কেউ খেতে পারলে না, আঁশটে গন্ধ। পাখীগুলি দেখতে কিন্তু বেশ। খুর খুর ক'রে হাঁটে, কেউ আসছে দেখলে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চেয়ে দেখে, তারপর 'কোঁক' ক'রে একটা শব্দ ক'রে উড়ে যায়। আবার আর একটু দূরে গিয়ে বসে। ভুবন সোমের হঠাৎ মনে হ'ল, কিন্তু আসল পাখী কই, হাঁস তো একটিও দেখা যাচ্ছে না! শুধুহাতে ফিরতে হবে নাকি শেষটা! কিন্তু না, পাখী নিয়ে ফিরতেই হবে তাঁকে, তা না হ'লে অনিলের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। আর একটু দূরে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। আজ যদি না পাওয়া যায় এইখানেই থেকে যাবেন তিনি কোথাও, কাছে-পিঠে গ্রাম নিশ্চয়ই আছে। অনিল তো বলেছিল, আছে। হাতঘড়িটা দেখলেন, প্রায় আটটা বাজে। এত বেলায় পাখী পাওয়া শক্ত। ওই ব্যাটারাই আগে থাকতে এসে সব উড়িয়ে দিয়ে গেছে। তবে কতক্ষণ আর উড়বে ওরা, বসতে হবেই কোথাও না কোথাও। ঘাড় হেঁট ক'রে দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে হাঁটতে লাগলেন তিনি। বালিগুলো চিকমিক করছে রোদ প'ড়ে।...

কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল, জলের ধারে একটা ছেঁড়া খাটিয়া আর দু-তিনটে ভাঙা কলসী প'ড়ে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন, কয়লাও রয়েছে। কেউ মড়া পুড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ বাবার মৃত্যুটা মনে পড়ল। তারপর মায়ের, তারপর স্ত্রীর, ছুটো ভাগ্নের, বিরিঞ্চিলালের, জগন্নাথের। সকলকে এই

গঙ্গার জলে নিজে হাতে বিসর্জন দিয়ে গেছেন তিনি। প্রত্যেকের শেষকৃত্য নিখুঁতভাবে করেছেন। তাঁর নিজের সময়ও তো আসন্ন। তাঁর মৃত্যু হ'লে কে তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে আসবে? বাড়িতে তো কেউ নেই। পাড়ার সৎকার-সমিতির ছোঁড়াগুলোই আনবে হয়তো। পেটরোগা নিমাই, রগচটা শ্রীদাম, মোটা ভোম্বল, গাঁজাখোর হরেন, মাতাল ফটিক—এদের সকলের মুখগুলো ভেসে উঠল মনে। এদের কাঁধে চ'ড়েই শেষগতি হবে তাঁর! বিলেত-ফেরত বিলু আর সন্ন্যাসী নিপু আসবে কি? 'আসবে না, আসবে না, আমার দিকে কেউ কখনও তাকায় নি, তাকাবে না। বেটার লাক্ নেক্স্ট্ টাইম, মানে পরজন্মে।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বললেন ভুবন সোম। তারপর আবার হাঁটতে লাগলেন।

একটা কথা মনে হ'ল হঠাৎ। বিরিঞ্চিটা মরবার দিনকতক আগে রসগোল্লা খেতে চেয়েছিল। রসগোল্লার বদলে তিনি ধমক দিয়েছিলেন। এখন হঠাৎ মনে হ'ল, অন্যায় করেছিলেন। দিলে কি আর এমন হ'ত—শেষ পর্যন্ত ম'রেই তো গেল। চন্দর ডাক্তার দিতে বলেছিল, তিনিই দেন নি।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে লাগলেন। গতিবেগ মন্দ হয়ে এল, কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ হাঁটলেন। চমকে উঠলেন হঠাৎ পাখীর ডাক শুনে। চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন, এক ঝাঁক টিয়া ডাকতে ডাকতে এক পাক খেয়ে উড়ে গেল আবার—যেন রসিকতা ক'রে গেল! ভুবন সোমের মনে হ'ল, ওরা বোধ হয় গঙ্গার হাওয়া খেতে এসেছিল। গঙ্গার ধারের পাখী ওরা নয়।

চলতে চলতে একবার দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। এ ভাবে কতক্ষণ হাঁটবেন? কিন্তু গত্যন্তরই বা কি আছে, হাঁটতেই হবে—

পাখী না নিয়ে আজ ফেরা চলবে না। পাখীগুলো ভড়কেছে খুবই, কিন্তু কোথাও না কোথাও বসবে তো—সেইখানেই যাবেন তিনি। যেতেই হবে।

ফের হাঁটতে শুরু করলেন, পা দুটো ব্যথা করছিল, তবু থামলেন না। সামনে আবার একটা বালির টিলা, ওপারে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। কষ্ট ক'রে উঠলেন টিলাটার উপর। উঠে দেখতে পেলেন, একটি লোক একটু দূরে ছিপ ফেলে ব'সে আছে।

টিলা থেকে নেবে গেলেন তার কাছে। দেখলেন, লোকটা দুই হাঁটুর মাঝখানে মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে ব'সে আছে। এ রকম লম্বা জঙ্ঘা তিনি আর দেখেন নি কখনও। ঠিক যেন মনে হচ্ছে, হাড়কাটে মুণ্ডু গলিয়ে দিয়েছে।

ভাঙা হিন্দিতে প্রশ্ন করলেন, 'ইধার চিড়িয়া কাঁহা বৈঠতা হ্যায় মালুম হ্যায় কি?' শুনতেই পেল না নাকি! একটু চেঁচিয়ে বললেন। যখন হাড়কাট থেকে মুণ্ডুটি বের ক'রে তাঁর দিকে চাইল তখন চাউনি দেখে মনে হ'ল, লোকটি ভাল মানুষ। একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। বিস্মিত হলেন যখন সে পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে।

'আর একটু এগিয়ে যান, কিছুদূর গিয়ে ছোট একটা গ্রাম পাবেন, গ্রামটা পেরিয়ে দেখবেন গঙ্গা একটু বেঁকে গেছে, সেই বাঁকের মুখে অনেকগুলো পাখী আছে, একটু আগেই দেখে এসেছি।'

'আপনি বাঙালী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের আগেকার বাস ছিল হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রামে। আমার ঠাকুরদা সেখান থেকে বাস উঠিয়ে চ'লে

আসেন বীরভূম জেলায়। এখন সেইখানেই বাড়ি। দুবরাজপুরের কাছেই।'

ভুবন সোম বুঝলেন, লোকটি বাক্যবাগীশ।

'এখানে কি করেন ?'

'এখান থেকে ক্রোশ দুই দূরে একটা মাইনর স্কুল আছে সেখানেই মাস্টারি করি। চাকরি ভাল নয়, কিন্তু জল-হাওয়া ভাল। সেই লোভেই থাকা। ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী কিনা—'

'আমি সোজা চ'লে যাব ?'

'হ্যাঁ, সোজা চ'লে যান। একটু গেলেই গ্রামটা দেখতে পাবেন। ওরা লোকও ভাল।'

ভুবন সোম আর দাঁড়ালেন না, হাঁটতে শুরু ক'রে দিলেন। পাখী আছে শুনে তাঁর দেহমনে আবার উৎসাহের সঞ্চার হ'ল। কিছুদূর হেঁটে সত্যিই গ্রাম দেখতে পেলেন একটা। গ্রাম মানে, দু-চারটে ছোট কুঁড়েঘর, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে চোখে পড়ল, একটা মেয়ে গোবর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আর একটু গিয়েই কিন্তু থেমে গেলেন। ও বাবা, এখানেও যে মোষ রয়েছে কয়েকটা! একটু দাঁড়িয়ে মোষগুলোর সঙ্গে বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা ক'রে আবার চলতে লাগলেন।

তাঁর ইচ্ছে ছিল, গ্রামে গিয়ে একটু জিরিয়ে তারপর পাখীর খোঁজে বেরুবেন। একটু ক্লান্ত বোধ করছিলেন। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে সেদিন দুঃখ লেখা ছিল। গ্রামের কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময় কে একজন চিৎকার ক'রে উঠল, 'ভাগিয়ে বাবু, ভাগিয়ে— জল্‌দি ভাগিয়ে।' ভুবন সোম ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, একটা মোষ তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে। সেই বিহনিয়াটা! কি সর্বনাশ!

প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন, কিন্তু মোষের সঙ্গে ছুটে পারবেন কেন? আর একটু হ'লেই মোষের গুঁতোয় প্রাণটা বেরিয়ে যেত তাঁর। কিন্তু যে মেয়েটা গোবর কুড়োচ্ছিল সে চিৎকার ক'রে উঠল, 'এই সুবোধ, খাড়া র।' মন্ত্রের মত কাজ হ'ল, মোষটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভুবন সোম একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলেন। দেখলেন, মেয়েটি এগিয়ে আসছে। এসে মোষটার কান ম'লে দিয়ে বললে, 'ফের বদমাশি! এই একটু আগে অত মার খেয়েছিস তবু লজ্জা নেই!'

মোষটা ঘাড় নীচু ক'রে বকুনিটি শুনলে, তারপর ঘাড় তুলে ভুবন সোমের দিকে আবার চাইলে। তার ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয় নি। ভুবন সোম এতক্ষণ নজর করেন নি, এবার দেখলেন মোষের মাথায় শিঙের ঠিক নীচেই একটা ন্যাকড়া জড়ানো রয়েছে। ভাবলেন, আর কাউকে গুঁতিয়ে খুন ক'রে এসেছে বোধ হয়, তারই কাপড়ের টুকরো শিঙে লেগে আছে।

তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন মেয়েটার মুখে বাংলা কথা শুনে। ওই মাস্টারের মেয়ে নাকি! এই ভাবে মাঠে মাঠে গোবর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে!

মোষটা আবার তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মেয়েটা আবার ধমক দিলে, 'এই সুবোধ, ফের '

মোষটা আবার দাঁড়িয়ে গেল, ল্যাজটা ঘন ঘন নাড়তে লাগল খালি।

'চল্, তোকে বেঁধে রেখে আসি, মহা পাজি হয়েছিস তুই—'

মেয়েটা সড়াৎ ক'রে চ'ড়ে পড়ল মোষটার পিঠে। কোন সুদক্ষ ঘোড়সোয়ার অত তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারত না।

ভুবন সোম অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। ওই দুর্দান্ত যমদূতের নাম সুবোধ! আশ্চর্য মেয়ে তো! মহিষমর্দিনীর কথা চণ্ডীতে পড়েছিলেন, আজ স্বচক্ষে দেখলেন।

ও বাবা, এ কি কাণ্ড! দেখলেন, মেয়েটা মোষের পিঠে শুয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরেছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবন সোম। মোষটা হেলতে দুলতে তাকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে চ'লে গেল।

অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন তিনি। দেখলেন, একটু দূরে একটা উঁচু মত জায়গা রয়েছে। তারই উপর গিয়ে বসলেন। মনে হ'ল, কি কুক্ষণেই বেরিয়েছিলেন আজ! ডিম জিনিসটা সত্যই অপয়া, অত্যন্ত অপয়া। আর একবার ডিম সঙ্গে নিয়ে গিয়ে এই কাণ্ড হয়েছিল রাজমহলে। আগে জানলে অনিলকে বারণ করতেন তিনি। আজকালকার ছোকরারা এসব জানেও না, মানেও না। এখনও পেটে ওম্‌লেট গজগজ করছে। ওটি হজম না হওয়া পর্যন্ত আজ আর নিস্তার নেই।

গঙ্গার দিকে চেয়ে ব'সে রইলেন তিনি। একটা মাছরাঙা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বহমান স্রোতের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শান্তি পেলেন একটু। ক্লান্তিও ঘুচল খানিকটা।

'খাটিয়া পর বৈঠি হুজুর—'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন শালপ্রাংশু মহাভুজ একটি প্রৌঢ় তাঁকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করছেন। মুখটা অনেকটা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত—অন্তত দাড়িটা সেইরকম। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, গলায় একটা ময়লা পৈতে ঝুলছে। মাঠের উপর কখন সে যে ছোট একটি দড়ির খাটিয়া পেতে তার উপর রঙিন চাদর বিছিয়ে দিয়েছে তা তিনি টের পান নি।

আবার সে হাত জোড় ক'রে ডাকলে, 'খাটিয়া পর বৈঠি রৌঁয়া।'

'রৌঁয়া' মানে 'আপনি'। লোকটির মুখের ভাব ভদ্র ব'লে মনে হ'ল, উঁচু জায়গাটা থেকে নেমে এলেন ভুবন সোম। লোকটি ঝুঁকে নমস্কার করল। ভুবন সোম প্রতি-নমস্কার ক'রে জিগ্যেস করলেন, 'কি নাম তোমার ?'

'চতুর্ভুজ গোপ।'

গয়লা অথচ গলায় পৈতে! সবাই পৈতে নিচ্ছে আজকাল, বামুনের ছেলেরা তাই বোধ হয় পৈতে ফেলে দিচ্ছে। কত রকমই যে দেখতে হবে।

খাটিয়ায় বসলেন।

তারপর বললেন, বাংলাতেই বললেন, 'শিকার করতে এসেছি। এখানে হাঁস বসে শুনেছি—'

'চিড়িয়া তো বহুত বা—'

'কাঁহা ?'

'নওলকিশোর কা ক্ষেত বরাবর। সিধা পূরব—'

হাত তুলে সে দেখিয়ে দিলে কোথায় পাখী আছে।

ভুবন সোম উঠে পড়লেন খাটিয়া থেকে। অনেকক্ষণ দেরি হয়ে গেছে। ভাবলেন, আর দেরি করা ঠিক হবে না। সন্ধান যখন পাওয়াই গেল, তখন এগিয়ে দেখাই যাক। সমস্ত ক্লান্তি যেন অপনোদিত হয়ে গেল এ সংবাদে। চতুর্ভুজ গোপ বালিয়া জেলার ভাষায় তাঁকে বললে যে, খাটিয়ার উপর আরাম ক'রে নিয়ে তারপর গেলেও চলবে। পাখীরা সমস্ত দিনই ওখানে থাকে। ভুবন সোম কিন্তু এ অনুরোধ রাখলেন না, একটি সিগার ধরিয়ে বন্দুকটি কাঁধে তুলে বেরিয়ে পড়লেন।

গ্রামের ভিতর দিয়েই সরু পথ। সেইটে ধ'রেই চললেন। দেখতে পেলেন বিহনিয়াকে একটা শক্ত খুঁটোয় লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বিহনিয়া ব'সে ছিল, তাঁকে দেখে রোষ-কষায়িতলোচনে উঠে দাঁড়াল আবার। দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তিনি। গ্রামটা পার হয়ে আবার বালির চর। বেশ ঢালু চর। নামতে কষ্ট হ'ল না। নেমে একটু দূরে দেখতে পেলেন সবুজ ক্ষেত। ওইটেই বোধ হয় নওলকিশোরের ক্ষেত। ওরই কাছাকাছি হাঁস আছে বলেছে চতুর্ভুজ গোপ। সোৎসাহে এগিয়ে চললেন। ক্ষেতের কাছাকাছি এসে দেখলেন, ক্ষেতের মাঝখানে ব'সে কয়েকজন ঘাস কাটছে, আর কয়েকজন কি যেন ওপড়াচ্ছে।

'ইধার চিড়িয়া হ্যায় ?'

'হাঁ বাবু। আউর থোড়া আগে বঢ়িয়ে।'

একটু কৌতূহল হ'ল ভুবন সোমের। কি ওপড়াচ্ছে ওরা ?

জিগ্যেস ক'রে জানলেন ছোলার গাছ। ওপড়াচ্ছে কেন ? বললে, বড্ড বেশী ঘন হয়ে গেছে তাই। যেগুলো তুলে ফেলছে সেগুলোও নষ্ট হবে না। ছোলার শাকও বিক্রি হয়, মানুষেও খায়, গরু-মোষেও খায়। গাছসুদ্ধ কাঁচা ছোলা পুড়িয়ে 'ওঢ়া' হয়। খুব সুখাদ্য।

'সিধা যাঙ্গে ?'

'হাঁ বাবু, মগর বিড়িঠো ফেক্ দিজিয়ে। মহক্ সে চিড়িয়া ভাগ যায় গা।'

ভুবন সোম সবে সিগারটি ধরিয়েছিলেন। প্রায় গোটাই ছিল, তবু ফেলে দিলেন সেটা।

ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সরু পথ, সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে নদীর বাঁকটা দেখতে পেলেন। হাঁসের ডাকও শোনা গেল। চখার ডাক। আর একটু এগিয়েই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা হ'ল তাঁর। সত্যিই এক ঝাঁক হাঁস ব'সে আছে। চখাও রয়েছে। ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন ভুবন সোম। রেঞ্জের মধ্যে আনা চাই। হাঁসের পালকগুলো যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে দেখা যাবে ততক্ষণ 'ফায়ার' করা ঠিক নয়। ডবল ব্যারেল বন্দুক তাঁর। ছুটো ব্যারেলেই টোটা পুরে ফেললেন। তারপর একটু ঝুঁকে বন্দুকটা পিছন দিকে লুকিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। মনে হতে লাগল যেন একটা বিরাট ৯ (লি) হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুদূর এইভাবে গিয়ে এক জায়গায় গুঁড়ি মেরে বসলেন তিনি। তারপর দড়াম্ দড়াম্ ক'রে ছুবার ফায়ার করলেন। হাঁসগুলো কলরব ক'রে উড়ল। ভুবন সোম দাঁড়িয়ে সোৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। একটাও পড়ে নি। অত্যন্ত হতাশ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকণ্ঠে কে যেন হেসে উঠল পিছনে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, সেই মেয়েটা— যে মোষের পিঠে চড়েছিল। মুখে কাপড় দিয়ে খিল খিল ক'রে হাসছে।

আচ্ছা অসভ্য তো! সবাই অসভ্য আজকাল। মনে পড়ল, একবার কলার খোলায় তাঁর পা পিছলে গিয়েছিল, তাই দেখে গবুটা হেসে উঠেছিল হি-হি ক'রে। তার গালে ঠাস্ ক'রে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, গবু নিজের ভাগ্নে ব'লেই মারা সম্ভব হয়েছিল। একে চড় মারা যাবে না। তাই তিনি হাসিটা যেন লক্ষ্য করেন নি এমনি ভাব দেখিয়ে উড়ন্ত হাঁসগুলোর দিকেই চেয়ে রইলেন। আর একটু এগিয়ে গেলেন। ভাবলেন, এইখানেই কোথাও আত্মগোপন ক'রে ব'সে থাকবেন খানিকক্ষণ। পাখীগুলো

বসলে—বসবে নিশ্চয়ই—আবার চেষ্টা করবেন। আজ একটা পাখী অন্তত নিয়ে যেতেই হবে। তা না হ'লে মান থাকবে না।

'শুনুন।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, সেই মেয়েটা তাঁর পিছু নিয়েছে।

'কি—'

মেয়েটা আর একটু এগিয়ে এল।

'আপনি নিরীহ পাখীদের উপর গুলি চালাচ্ছেন কেন? কি দোষ করেছে বেচারারা—'

সাংঘাতিক ডেঁপো মেয়ে তো! মুচকি মুচকি হাসছে আবার!

'তুমি মাংস খাও না বুঝি?'

'না।'

'তরিতরকারি খাও তো?'

'হ্যাঁ, তা খাই বইকি।'

'ওরাই বা কি দোষ করেছে! ওদের কেটে খাও কেন? ওদেরও প্রাণ আছে, কাটলে ওদেরও লাগে।'

'সত্যি? জানতাম না তো।'

মেয়েটি বাঁ হাতের তর্জনীতে কাপড়ের আঁচলটা জড়াতে লাগল।

'কিন্তু তরিতরকারি আর পাখী কি এক? কাটবার সময় ওদের রক্তও বেরোয় না, ওরা যন্ত্রণায় চিৎকারও করে না। কিন্তু পাখীদের মারলে তাদের রক্ত বেরোয়, তারা চিৎকার করে।'

নীচের ঠোঁট দিয়ে উপরের ঠোঁটটায় একটু চাপ দিয়ে চোখ-মুখের এমন একটা ভঙ্গী করল সে, যেন অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছে সে এবার।

'পেকে একেবারে ঝুনো হয়ে গেছে।' মনে মনে ভাবলেন ভুবন সোম।

মেয়েটিই আবার প্রশ্ন করল।

'আপনি পাখীর মাংস খুব ভালবাসেন বুঝি ?'

'এককালে বাসতুম, এখন আর খাই না।'

'তা হ'লে ওদের মারতে এসেছেন কেন ?'

এর কোনও সদুত্তর সহসা মাথায় এল না ভুবন সোমের।

কিছু না ব'লে আবার এগোতে লাগলেন। কিন্তু মেয়েটা নাছোড়বান্দা, পিছু পিছু চলতে লাগল।

'পাখী যখন খান না, তবে কেন বেচারীদের মারছেন ? ছেড়ে দিন।'

'আজ একটা পাখী অন্তত মারতেই হবে, তা না হ'লে বাজিতে হেরে যাব। মান থাকবে না।'

'ও, বাজি রেখেছেন বুঝি !'

এইবার যেন একটা সঙ্গত কারণ পেল সে। কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, 'কিন্তু আপনি যেভাবে শিকার করছেন তাতে একটি পাখীও মারতে পারবেন না, বাজিতে হেরে যাবেন।'

এ আশঙ্কা ভুবন সোমের নিজেরও হচ্ছিল।

'কি করা যায় বল তো ?'

'আমি যা যা বলব তা করবেন ?'

'বল, কি করতে হবে !'

'আমার সঙ্গে আসুন তা হ'লে।'

যাবেন কি না প্রথমে ঠিক করতে পারলেন না ভুবন সোম। একটা ফাজিল মেয়ের ধাপ্পায় ভুলে সময় নষ্ট করা কি উচিত হবে ?

ও শিকারের কি জানে! শেষটা আবার কি বিপদে প'ড়ে যাবেন ঠিক নেই, ডিম এখনও হজম হয় নি।

'আসুন না।'

নাছোড়বান্দা মেয়ে, যেতেই হবে। দেখাই যাক। না হয় একটু দেরিই হবে।

মেয়েটা গ্রামের দিকে ফিরল। ভুবন সোম পিছু পিছু যেতে লাগলেন। ঢালু চড়াটা নামতে কোনও কষ্ট হয় নি। ওঠবার সময় ঈষৎ শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। মেয়েটার কিন্তু গ্রাহ্য নেই, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। আর মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে চাইছে, মুচকি মুচকি হাসছে, আর ঝাঁকড়া চুলগুলো মুখের উপর থেকে সরিয়ে সরিয়ে নিচ্ছে। টগর অনেকটা এই রকম ছিল, মনে পড়ল ভুবন সোমের।

যেতে যেতে আলাপ হ'ল।

'তুমি বুঝি ওই মাস্টারবাবুর মেয়ে?'

'কোন্ মাস্টারবাবু—'

'যিনি ওই দিকে ছিপ ফেলে মাছ ধরছেন।'

'না। আমি তাঁর মেয়ে হতে যাব কেন? আমার বাবার নাম চতুর্ভুজ গোপ, যিনি আপনাকে খাটিয়া পেতে দিলেন।'

বলে কি! ওই চৌ-গোঁপ্পা চতুর্ভুজের মেয়ে এমন বাংলা বলতে পারে!

'তুমি বাংলা শিখলে কি ক'রে?'

'আমার মামার বাড়ি যে পাকুড়, সেইখানেই মানুষ হয়েছি আমি। এখানেও বাংলা পড়েছি কিছুদিন। যিনি মাছ ধরছেন

তিনিই আমাকে বাংলা পড়িয়েছেন। খুব ভাল পড়ান, কিন্তু একটু কালা—'

যে সখীচাঁদের নামে তিনি রিপোর্ট করবেন ঠিক করেছেন, তারই কিশোরী পত্নী বৈদেহীর সঙ্গে যে তিনি আলাপ করছেন—এ কথা তিনি কল্পনা করতে পারলেন না। কল্পনা করা সম্ভব ছিল না।

তিনি অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

'তুমি না থাকলে ওই মোষটা আজ আমাকে মেরেই ফেলত। তোমার কথা খুব শোনে তো! সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।'

'বাঃ, শুনবে না! আমি যে ওকে বাচ্চাবেলা থেকে মানুষ করেছি। ছেলেবেলায় খুব শান্ত ছিল, খালি ঘুমোত, তাই ওর নাম রেখেছিলাম সুবোধ। কিন্তু যত বড় হচ্ছে ততই দুর্দান্ত হয়ে উঠছে। আজ ভোরে কোথায় গিয়ে মারামারি ক'রে এসেছে। কপালটা কেটে গেছে। টিঞ্চার লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়েছি।'

ভুবন সোমের বুঝতে বাকি রইল না যে, ভুট্টার লাঠির চোটেই সুবোধের কপাল কেটেছে। কিন্তু সে কথাটা চেপে গেলেন।

'টিঞ্চার দিলেই সেরে যাবে, নয়?'

'হ্যাঁ, তা যাবে।'

'আপনি কি বাঙালী?'

'হ্যাঁ।'

'তা হ'লে সাহেবী পোশাক পরেছেন কেন?'

'আচ্ছা ফক্কোড় মেয়ে তো'—মনে মনে বললেন ভুবন সোম। মুখে বললেন, 'সাহেবী পোশাক পরলে চলা-ফেরার সুবিধা হয়।'

'আমার বাবার সঙ্গে আপনি চলতে পারবেন? রোজ ভোর তিনটেয় উঠে উনি হাঁসবর যান, আবার দুপুরে এখানে এসে খান।

খেয়ে আবার যান, ফিরে আসেন রাত দশটায়। হাঁসবর এখান থেকে আড়াই ক্রোশ।'

'সেখানে যান কেন?'

'সেখানে আমাদের জমি আছে।'

'কিন্তু আজ তো যান নি দেখলাম।'

'না, আজ এখানেই কাজ ছিল।'

এমন সময় দূর থেকে ডাক শোনা গেল—'এ বিদিয়া, বিদিয়া গে-এ এ—'

'বাবা ডাকছেন। বাবাই আমাকে আপনার খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। আপনি যেন গিয়ে আমার নামে নালিশ করবেন না। বরং বলবেন, আপনার মেয়ে বিদিয়া লছমী। কেমন?'

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে বিদিয়া ছুটল।

ভুবন সোম আর একবার ফিরে আকাশের দিকে চাইলেন। হাঁসগুলোকে আর দেখতে পেলেন না। কোথাও বসেছে নিশ্চয়। চোখে পড়ল একটা ছোট্ট সাদা মেঘ ঠিক হাঁসের মত ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে, আকাশটা যেন নীল সরোবর। খানিকক্ষণ সেটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্ষেতে যে মজুরগুলো কাজ করছিল তাদের মধ্যে একজন ব'লে উঠল—

'ঘণ্টাভর বাদ আইহো বাবু। অভি থোড়া দের দম্ মারিকে বৈঠি যা।'

ভুবন সোমের মনে হ'ল ফপরদালাল সর্বত্র। তিনি কি জানেন না যে, এখন অপেক্ষা করতে হবে!

বিদিয়ার গ্রামের দিকে চলতে লাগলেন। একটু দূরে গিয়ে দেখলেন, বিদিয়া আবার আসছে।

'আপনি অত আস্তে আস্তে হাঁটছেন কেন, তাড়াতাড়ি আস্থন। আপনার জন্যে বাবার কাছে মিছিমিছি বকুনি খেলুম। বাবা বললেন—তুই দৌড়ে চ'লে এলি কেন, ওঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়। চলুন—'

ভুবন সোম গতিবেগ আর একটু বাড়ালেন। চতুর্ভুজ গোপের বাড়ির কাছাকাছি হতেই চতুর্ভুজ গোপ বেরিয়ে এল আবার। ছুটি হাত জোড় ক'রে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে আবার খাটিয়ায় বসাল তাঁকে। তারপর বালিয়া জেলার ভাষাতে যা বললে তার ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায়—বন্দুকের আওয়াজ সে শুনেছে। ও-রকম এলোপাতাড়ি আওয়াজ করলে পাখী পাওয়া যাবে না। এই চরে পাখী শিকারের 'ভাঁজ' ও-রকম নয়। এখানে অন্য রকম কৌশল করতে হবে। রৌঁয়া এখানে খেয়ে দেয়ে চারপাইয়ের উপর একটু আরাম করুন। তারপর বিদিয়া সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। ও সব জানে। ওর বয়স একটু কম হ'লে কি হবে, ও খুব চালাক মেয়ে, তবে বড় বদমাশ। কিছুদিন পরেই ওর 'গওনা' হবে, কিন্তু এখনও ওর কোন বিষয়ে লুর (হুঁশ) নেই। কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় জানে না, কি ক'রে হাঁটতে হয় তাও জানে না। কচি লেরুর (বাছুরের) মত সারাদিন লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিদিয়া বাপের পিছন থেকে ইশারা করলে।

ভুবন সোম ভাঙা হিন্দিতে বললেন, 'আপকা লেড়কি তো লছমী হ্যায়।' এ রকম নির্জলা মিথ্যে কথা জীবনে তিনি খুব কম বলেছেন।

এ কথা শুনে চতুর্ভুজের সিংহতুল্য বদনটি খুশিতে ভ'রে উঠল, চোখ ছুটি বুজে এল। ক্ষণকাল অভিভূত হয়ে থেকে সে বললে, 'আপলোগ্‌কা আশিরবাদ—'

তারপর বিদিয়ার দিকে ফিরে বললে, 'দহি-চূড়া লাও বেটী। বাবুকে খিয়াও।'

ভুবন সোম শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। বললেন তিনি একটু আগেই খেয়েছেন, এখন ক্ষিদে নেই। বিদিয়া পিছন থেকে ধমক দিয়ে উঠল, 'তবু খেতে হবে। বাবার মান রাখবার জন্যে সামান্য একটু খান। বাড়ি থেকে অতিথি যদি না খেয়ে যায় ওঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়।'

ভুবন সোম চতুর্ভুজের দিকে ফিরে দেখলেন, সে হাত জোড় ক'রে আছে। মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু মুখভাবে যা প্রকাশিত হচ্ছে তা বলার বাড়া। ভুবন সোম আর আপত্তি করতে পারলেন না।

বিদিয়া একটি চকচকে পরিষ্কার কানা-উঁচু কাঁসার থালায় মোটা মোটা লাল চিঁড়ে নিয়ে এল।

'ও বাবা, এ যে স্বয়ং মা-লক্ষ্মী দেখছি!'—মনে মনে বললেন ভুবন সোম।

তারপর বিদিয়া নিয়ে এল মাটির ভাঁড়ে খানিকটা দই, আর কিছু ঢেলা গুড়। আর এক ছড়া মর্তমান কলা।

চতুর্ভুজ হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ভুবন সোম জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি কাছে-পিঠে কোনও দোকান আছে?'

'না, এ সবই আমাদের ঘরের।'

'তাই না কি? বাঃ! তোমার বাবাকেও দাও না, একসঙ্গে খাওয়া যাক।'

'আপনার খাওয়া না হ'লে উনি খাবেন না।'

চতুর্ভুজ হাসিমুখে মাথা নেড়ে জানালে যে, বিদিয়া যা বলছে ঠিক। সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তার ওইটুকু মেয়ে বিদিয়া একজন প্রবীণ বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে অনর্গল বাংলায় আলাপ ক'রে যাচ্ছে এতে সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে চ'ড়ে বসেছিল। মুখ দিয়ে তার কথা সরছিল না।

ভুবন সোম যতটা পারলেন খেলেন। তাঁর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে চতুর্ভুজ গোপ খেতে বসল। তাঁর সামনেই বসল। তার খাওয়ার বহর দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। আধ সের চিঁড়ে তো হবেই, তার সঙ্গে প্রায় সেরখানেক দই, পোয়াটাক গুড়, আর গোটা ছয়েক কলা, দেখতে দেখতে নিঃশেষ ক'রে ফেললে চতুর্ভুজ। তারপর আলগোছে এক ঘটি জল খেয়ে সুদীর্ঘ ঢেঁকুর তুললে একটি।

মুখ ধুয়ে এসে চতুর্ভুজ গামছায় হাত-মুখ মুছতে মুছতে বললে, রেঁায়া তা হ'লে খাটিয়ার উপর আরাম করুন, সে এখন মাঠে যাচ্ছে। বিদিয়া একটু পরে ওঁকে শিকারের 'ভাঁজ' সব ঠিক ক'রে দেবে।

বিস্ময়ে ভুবন সোমের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। এই গুরু ভোজনের পরও লোকটা আড়াই ক্রোশ পথ হেঁটে যাবে!

একটু পরেই মহিষের চামড়ার তৈরি নাগরা জুতো প'রে—বাইরে চালের বাতায় গোঁজা ছিল সে দুটি, আর প্রকাণ্ড একটি তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ক'রে চতুর্ভুজ গোপ বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বার বার আশ্বাস দিয়ে গেল যে সব ঠিক হয়ে যাবে, তিনি একটু আরাম ক'রে নিন আগে।

বিদিয়া বললে, 'আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি একটু আসছি বাইরে থেকে—'

'তুমি খেলে না ?'

'আমি দশটার সময় খেয়ে নিয়েছি। আমি স্কুল যেতাম তো, সেই আগেকার অভ্যাস থেকে গেছে।'

বিদিয়া একটা ছোট পাত্রে খানিকটা ছাতু মাখতে লাগল।

'ও আবার কার জন্যে ?'

'সারির জন্যে। এ আমার এক জ্বালা হয়েছে, আমি শ্বশুর-বাড়ি চ'লে গেলে কে যে ওকে খেতে দেবে জানি না।'

'সারি কে আবার ? তোমার বোন নাকি ?'

'বোন কেন হতে যাবে! পোষা শালিক পাখী।'

'কই, কোথায় ?'

'এখন চরতে গেছে। একটু পরে আসবে। এসে খাবার না দেখলে হাল্লা করবে।'

বিদিয়া একটা খালি খাঁচা বার করলে। তার ভিতর ছোট একটা বাটিতে মাখা ছাতুটা রেখে, বারান্দায় টাঙিয়ে দিয়ে এল খাঁচাটা।

তারপর বললে, 'ওই যে তালগাছটা দেখছেন, আর একটু স'রে আসুন—তা হ'লেই দেখতে পাবেন ওই তালগাছে ওর জন্ম হয়েছিল গত বৈশাখে। একদিন দেখি, গাছের উপর থেকে প'ড়ে গেছে, ভাগ্যে আমি ওইখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই দেখতে পেলাম। তারপর তুলে এনে এই খাঁচাটায় রেখে মানুষ করলাম। ওর মা এসে ওকে ফড়িং খাইয়ে যেত। আমি ছাতু খাওয়াতাম। তারপর যখন পালক-টালক গজাল, একদিন এসে দেখি, খাঁচা থেকে উড়ে গিয়ে নিজেই চ'রে বেড়াচ্ছে। মনে হ'ল, বাঁচলাম, রোজ রোজ কে ওর সেবা করবে! ওমা, তার পরদিন দেখি ঠিক খাঁচায় এসে ব'সে আছে। আর রোঁয়া ফুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলছে—রেডিও রেডিও, রেডিও, কিক্ কিক্ কিক্ রেডিও! তার

মানে ছাতু দাও। দিলাম ছাতু মেখে। তারপর থেকে রোজ আসে—'

ভুবন সোম মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন।

'কখন আসে?'

'কোনও ঠিক নেই। আমি কি ওর জন্যে ব'সে থাকি নাকি? খানিকটা ছাতু মেখে রেখে দিয়ে নিজের কাজে চ'লে যাই। এসে দেখি, ঠিক খেয়ে গেছে। আপনাকে দেখলে হয়তো আসবে না, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমার দাদা এসেছিল ক্যামেরা নিয়ে, ওর একটা ফোটো তুলতে চাইল, কিছুতে বসল না। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি সুবোধের মাথায় আর একটু টিঞ্চার দিয়ে আসি। খাটটা ঘরের ভিতর নিয়ে যাই চলুন। চোখে আলো লাগলে আপনার ঘুম হবে না। সারিটাও আসবে না। ধরুন তো খাটটা, আমি একলা নিয়ে যেতে পারব না—'

ঘরের ভিতর ঢোকবার ইচ্ছা ছিল না ভুবন সোমের। কিন্তু দেখলেন বিদিয়ার আদেশ অমান্য করা যাবে না। ঠিক টগরের মত, তার মত জেদীও।

ধরাধরি ক'রে খাটটা ভিতরে আনা হ'ল।

'আপনি এইখানে ঘণ্টাখানেক শুয়ে থাকুন।'

'আমার দিনে ঘুমোনো অভ্যাস নেই।'

'চোখ বুজে শুয়ে থাকুন তবু খানিকক্ষণ। আমি আসছি—'

টিঞ্চার আয়োডিনের ছোট শিশিটা হাতে ক'রে বেরিয়ে গেল। দেখলেন, ঘরে টুকিটাকি অনেক ওষুধপত্র আছে একটা শেল্‌ফে। ভুবন সোম কি আর করবেন, শুলেন। শুয়েই কিন্তু উঠে পড়তে হ'ল তাঁকে। ও ফোটোটা কার? মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। উঠে ফোটোটার কাছে গেলেন। আরে, এ যে সখীচাঁদ

যাদবের ফোটো! ও হারামজাদার ফোটো এখানে এল কি ক'রে?

'আপনি এখনও শোন নি?'

বিদিয়া ফিরে এল।

'সুবোধের কপালটা অনেকখানি কেটে গেছে সত্যি। রক্ত গড়াচ্ছে দেখলাম। টিঞ্চারে কমবে তো? বৈরিয়ার বিভূতিবাবু ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছিলাম, তিনি টিঞ্চার পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতেই ঠিক ক'মে যাবে, কি বলেন?'

'যাবে। কিন্তু খুব বেশী দিও না। রোজ একবারের বেশী দিলে ঘা বেড়েও যায় শুনেছি। আচ্ছা, এ ফোটো কার?'

বিদিয়া মুখ ফিরিয়ে লজ্জা গোপন করলে।

তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, 'কারুর নয়।'

'কারুর নিশ্চয়ই। এ কে হয় তোমার?'

'আমার পতি।'

ব'লেই এক ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

বিদিয়ার পতি সখীচাঁদ যাদব! এ কি অদ্ভুত যোগাযোগ! খাটিয়ার উপর ব'সে পড়লেন ভুবন সোম। প্রায় মিনিট দশেক বিদিয়ার দেখা নেই। একটু পরেই বারান্দায় শোনা গেল—রেডিও রেডিও, কিক্ কিক্—

নিঃশব্দপদসঞ্চারে পিছনের একটা দরজা দিয়ে বিদিয়া এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, 'সারি এসেছে, দেখুন।'

ভুবন সোম বারান্দায় যেই বেরিয়েছেন অমনি পিড়িং ক'রে উড়ে গেল শালিকটা।

'আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছে।'

ভুবন সোম আবার ঘরের ভিতরে এলেন।

বিদিয়াও এল।

'তোমার পতি সখীচাঁদ যাদবকে আমি চিনি।'

'চেনেন?'

'হ্যাঁ। খুব দুষ্টু সে।'

'ঠিক বলেছেন। আমাকে লেখে কি জানেন? রোজ চিঠি লিখতে। রঙিন চিঠির কাগজ খাম আর ফাউণ্টেন পেন পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি রোজ চিঠি লিখি কি ক'রে বলুন তো! এখান থেকে পোস্টাফিস দু ক্রোশ। রোজ কে চিঠি পোস্ট করতে যাবে? মক্‌খুকে অনেক খোশামোদ ক'রে একদিন পাঠিয়েছিলাম। রোজ রোজ সে যাবে কি ক'রে—'

'তা তো বটেই। মক্‌খু লোকটি কে?'

'আমাদের চরবাহা, মানে আমাদের গরু-মোষ চরায়।'

'ও।'

'আপনি ওকে চিনলেন কি ক'রে? কোথায় আলাপ হ'ল?'

'আমিও যে রেলে চাকরি করি।'

'ও, তাই না কি! আচ্ছা, সোম সাহেব ব'লে আপনাদের এক উপরওয়ালা সাহেব আছেন শুনেছি। তিনি কেবল সকলের নামে রিপোর্ট ক'রে বেড়ান। উনি লিখেছেন, ওঁর নামে রিপোর্ট হয়েছে। আপনার নামেও রিপোর্ট করেছে নাকি?'

'না।'

ভুবন সোমের অবস্থা অবর্ণনীয়।

'উনি লিখেছেন, সোম সাহেব লোকটা খুব পাজী। নিজের ছেলের চাকরিটি পর্যন্ত খেয়ে দিয়েছেন। ঠিক আমার বিহনিয়ার মত, সকলকে গুঁতিয়ে বেড়াচ্ছে—'

ব'লেই হেসে ফেললে বিদিয়া।

ভুবন সোম বললেন, 'হ্যাঁ, খুব কড়া লোক। সখীচাঁদ ঘুষ নিয়েছিল—'

বাঘিনীর মত গর্জন ক'রে উঠল বিদিয়া।

'ঘুষ বলছেন কেন, 'উপরি' বলুন। প্যাসেঞ্জারদের উনি সুবিধা ক'রে দেন, তারা ভালবেসে ওঁকে দু-চার পয়সা দেয়। এতে দোষ কি আছে! আসলে লোকটা হিংসুট পাজী, অপরে দু পয়সা পাচ্ছে তা সহ্য করতে পারে না, তাই রিপোর্ট করেছে।'

ভুবন সোম চুপ ক'রে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলেন।

'ভুবন সোমের সঙ্গে আলাপ আছে আপনার?'

'আছে।'

'তাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন তো। যদি ওঁর চাকরিটি চ'লে যায়, তা হ'লে আমার আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না।'

'আচ্ছা, বলব।'

ভুবন সোম বেশ একটু বিপন্ন বোধ করছিলেন। কিন্তু কি করবেন তা তিনি জানতেন। রিপোর্ট তাঁকে করতেই হবে, কোনও কারণেই কর্তব্যে তিনি অবহেলা করবেন না। কালই তিনি স্টীমারে সেই ছোকরাকে জোর গলায় ব'লে এসেছেন—আমরা ওল্ড স্কুলের লোক, আমাদের মটো হচ্ছে ডিউটি ফার্স্ট, সেল্ফ লাস্ট।

'আপনি ঘুমুবেন না?'

'দিনে আমার ঘুম আসে না।'

'তবে চলুন, শিকারের ব্যবস্থাই করা যাক।'

বিদিয়া একটু পরে দুটো ময়লা শতচ্ছিন্ন কাপড় নিয়ে ফিরে এল।

'আপনার কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন, এইগুলো পরুন।'

'এইগুলো পরব ? তার মানে ?'

'ফরসা কাপড়চোপড়-পরা ভদ্রলোক দেখলেই হাঁসগুলো পালাবে। কিন্তু এই কাপড় প'রে যদি আপনি ওদের খুব কাছেও যান, তা হ'লেও ওরা উড়বে না। মনে করবে—আপনি বুঝি মজুর একজন। আমি কি ঠিক করেছি, শুনুন বলছি। আপনার বন্দুকটায় টোটা ভ'রে দিন, আমি সেটা নিয়ে ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দিয়ে লুকিয়ে চ'লে যাই। আমাকে এমনি দেখলে ওরা উড়ত না, কিন্তু বন্দুক থাকাতে উড়তে পারে। তাই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে যাব। ওদের খুব কাছে গিয়ে আমি আপনাকে ইশারা করব। আপনি তখন এই কাপড় প'রে আর এই গামছার পাগড়ি বেঁধে এক বোঝা বুটের শাক মাথায় নিয়ে আমার কাছে চ'লে আসবেন। ওরা দেখবেন উড়বে না। আপনাকে মজুর মনে করবে। আপনি তখন ফায়ার করতে পারবেন, বাজিও জিতে যাবেন। ক টাকা বাজি রেখেছেন ? বাজি জিতলে আমাকেও দেবেন তো কিছু ?'

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল বিদিয়া।

'টাকার বাজি রাখি নি, মানের বাজি। ওদের ধারণা, আমি পাখী মারতে পারি না। আজ ওদের দেখিয়ে দিতে চাই যে, আমিও পারি।'

'এখানে আর কখনও আপনি এসেছিলেন ?'

'না, দিলারপুর, বাঘাঢ়বিল, কাটাহা, ফসিয়াতল—এসব জায়গায় গেছি। কিন্তু এখানে এইবার প্রথম এলাম। মনে হচ্ছে, না এলেই হ'ত।'

ছোট ছেলেকে মা যে সুরে ভোলায়, বিদিয়ার কণ্ঠে সেই সুর ফুটল।

'এখানেও তো অনেক পাখী আছে। এবারে আপনি ঠিক মারতে পারবেন। সাহেবী পোশাক ছেড়ে এইগুলো প'রে ফেলুন। আর টোটা পুরে বন্দুকটা আমাকে দিয়ে দিন, আমি চ'লে যাই।'

'চল না, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। কাপড় বদলাবার দরকার কি, তুমি যদি লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে পার আমিও পারব।'

'পারবেন না, আপনি যে বড্ড লম্বা। যা বলছি শুনুন।'

'কাপড়গুলো যে বড্ড ময়লা!'

'ময়লা কাপড়ই তো দরকার। ময়লা-কাপড়-পরা লোকদের ওরা ভয় পায় না। ভয় পায় আপনাদের মত ফরসা-কাপড়-পরা লোকদের। আর এক কাজও করতে পারেন। গাছ সেজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিন্তু—'

'সে আবার কি রকম?'

'আমি কতকগুলো ঝাউগাছের ডাল কেটে আপনার গায়ে মাথায় পিঠে বেঁধে দেব। আপনাকে ঠিক ঝাউগাছের মত দেখাবে দূর থেকে। ওরই ভিতর বন্দুকটাও লুকিয়ে নিতে হবে। তারপর আপনি খুব আস্তে আস্তে এগুবেন। একটু এগুবেন, আবার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। তারপর আস্তে আবার একটু এগুবেন—'

বিদিয়া দেখিয়ে দিলে, কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে।

'এইরকম করতে করতে ওদের খুব কাছাকাছি যখন এসে পড়বেন, তখন বন্দুক চালাবেন। আপনি যদি খুব আস্তে আস্তে ওদের কাছে যেতে পারেন, তা হ'লে ওরা উড়বে না—আপনাকে ঝাউগাছ মনে করবে। দেখুন, কোন্‌টা আপনার পছন্দ সেই রকমই ব্যবস্থা করি।'

'এ ছাড়া অন্য উপায় নেই ?'

'না। তবে সকালবেলা ওরা যেমন করেছিল, তেমনি করলে হতে পারত। কিন্তু আপনার তো মোটর-বোট নেই। ওরা এসে সব পাখীগুলোকে উড়িয়ে দিলে, তারপর সেই উড়ন্ত অবস্থাতেই দমাদ্দম গুলি চালাতে লাগল তিন-চারজন মিলে। তাতে কয়েকটা জলে পড়ল। কিন্তু আপনি তা করবেন কি ক'রে ? আপনার বোট নেই, তা ছাড়া আপনি একা। আমি যা বলছি তাই করুন। ঠিক মারতে পারবেন। নবাবগঞ্জের জমিদারের ছেলে ছবিলালবাবু এইরকম ক'রে শিকার করেন। তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি আমি। তিনি একবার মজুর সেজেছিলেন, একবার ঝাউগাছও হয়েছিলেন। অনেকগুলো পাখী মেরেছিলেন তিনি।'

ভুবন সোম কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না সহসা। এক-একবার ভাবছিলেন, পাখী আর মারব না, ফিরে যাই। কিন্তু ছট্টু সেন, কার্তিক আর অনিলের—বিশেষ ক'রে অনিলের মুখটা মনে পড়াতে মত বদলাতে হ'ল তাঁকে। অন্তত একটা নিয়ে যেতে পারলেও মান রক্ষা হবে।

'আপনি মজুর সেজেই চলুন প্রথমে। তাতে যদি না হয় ঝাউগাছ হবেন। বন্দুকটা আমাকে দিন টোটা পুরে—'

মনস্থির ক'রে ফেললেন ভুবন সোম। দেখাই যাক না, কি হয়। টোটা পুরে বন্দুকটা দিয়ে দিলেন তাকে। লক্ ক'রে দিলেন। মেয়েটা যে রকম ছটফটে আর ফাজিল, অ্যাক্সিডেণ্ট না ক'রে বসে!

'আপনি তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে আসুন। আমি অড়র-ক্ষেতের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছি। নওলকিশোরের ক্ষেতের মজুরগুলোকে ব'লে যাচ্ছি, তারা আপনাকে এক বোঝা বুটের শাক

দিয়ে দেবে। আপনি প্রথমে যে জায়গায় বন্দুক ছুঁড়েছিলেন আমি তারই কাছাকাছি গিয়ে ব'সে থাকব কোথাও। যেখানে হাঁস দেখব সেইখানেই ব'সে পড়ব। আমি ইশারা করলে, তবে আপনি যাবেন। কেমন ?'

বন্দুকটি নিয়ে বেরিয়ে গেল বিদিয়া। ভুবন সোম প্যাণ্ট ছেড়ে মক্‌খুর কাপড় পরতে লাগলেন। উঃ, কি দুর্গন্ধ! কখনও কাচে না বোধ হয়। চুলুহার কথা মনে পড়ল। বহুকাল পূর্বে চুলুহা ব'লে তাঁর এক চাকর ছিল। দৈত্যের মত চেহারা। কিন্তু শখ ছিল 'টাইট' গেঞ্জি পরবার। বেছে বেছে গলাবন্ধ ছোট মাপের গেঞ্জি কিনত। দু-তিনজনে মিলে তাকে পরাত সেই গেঞ্জিটা। গেঞ্জি এত টাইট হ'ত যে, পরার পর খানিকক্ষণ হাত ঝোলাতে পারত না সে। সেই যে একবার গেঞ্জিটা পরত—বাস্। আর খুলত না গা থেকে। সেটা গা থেকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে প'ড়ে যেত। এরা পারতপক্ষে কেউ কাপড়-জামা কাচে না।

…হাঁটু পর্যন্ত ময়লা কাপড় প'রে, মাথায় ময়লা গামছার পাগড়ি বেঁধে, খালি গায়ে যখন বের হলেন ভুবন সোম তখন একটা দেখবার মত দৃশ্য হ'ল। তাঁর বুকে পিঠে পেটে প্রচুর লোম ছিল। বহুদিন তারা এমন মুক্ত বাতাস এবং আলোর স্পর্শ পায় নি। গঙ্গার চরের হাওয়া-আলো লেগে তাদের মধ্যেই শিহরণ জাগল প্রথম। সত্যিই ভুবন সোমের রোমাঞ্চ হ'ল। যদিও বেলা প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল, রোদও উঠেছিল বেশ, তবু একটু একটু শীত করতে লাগল তাঁর। একটু জোরে পা চালিয়ে চলতে লাগলেন। নওলকিশোরের ক্ষেত বেশীদূর নয়। যতটা খারাপ লাগবে ভেবেছিলেন ততটা খারাপ কিন্তু লাগছিল না। বরং মনে

হচ্ছিল যেন নব-জন্মলাভ করেছেন। হঠাৎ শৈশবসুলভ চাপল্য ফিরে এল যেন। বেশ দ্রুতপদে, প্রায় দৌড়ে, তিনি নওল-কিশোরের ক্ষেতে গিয়ে পৌঁছলেন।

মজুরগুলো তখনও কাজ করছিল সেখানে, তাঁকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

একটা ছোঁড়া-গোছের মজুর দাঁত বের ক'রে বললে, 'চিড়িয়াকো লালচসে বাবু মজদুর বনি গেলছে।' অর্থাৎ পাখীর লোভে বাবু মজুরে রূপান্তরিত হয়েছেন।

অন্য সময় হ'লে ভুবন সোম চ'টে উঠতেন। এখন কিন্তু চটলেন না, উপভোগ করলেন রসিকতাটা। তাদের পাশে ব'সে বললেন, 'লালচসে নেহি, জিদসে। চিড়িয়া আজ মারণেই হোগা একঠো। বিদিয়া কাঁহা গিয়া?'

একজন মজুর ক্ষেত থেকে বেরিয়ে গেল। ভুবন সোমও গেলেন তার পিছু পিছু। গিয়ে দেখলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে একটু আগে তিনি ফায়ার করেছিলেন তার কাছে-পিঠে কোনও পাখী নেই, বিদিয়াও নেই।

'হে গে বিদিয়া গে—'

তারস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল মজুরটা কানে হাত দিয়ে।

'ওতনা জোর সে মৎ চিল্লাও। পাখী ভড়ক্ যায় গা।'

লোকটা হেসে বললে, তাদের ডাকে পাখী ভড়কাবে না। তারা ক্রমাগতই এ রকম হাঁকাহাঁকি করে, পাখীরা ঠিক ব'সে থাকে। আবার ঠিক তেমনি ভাবে কানে হাত দিয়ে আর একবার চেঁচালে, কিন্তু বিদিয়ার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ভুবন সোম তখন মজুরটাকে এক বোঝা বুটের শাক নিয়ে আসতে বললেন। ভাবলেন, সেইটে মাথায় নিয়ে নদীর ধারে ধারে

যাওয়া যাক। কিছু দূর গিয়ে বিদিয়ার দেখা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

লোকটা ঘাসের বোঝা এনে দিয়ে দাঁত বার ক'রে বললে, 'একঠো মোটা বিড়ি মিলতিয়ে হুজুর!'

সিগার চাইছে।

'হামরা সাথ তো নেই হ্যায়। পিছে দে গা, বিদিয়াকা ঘরমে রাখকে আয়া।'

মাথায় শাকের বোঝা নিয়ে হাঁটছিলেন তিনি। কোথায় পাখী! একটিও তো দেখা যাচ্ছে না! কেবল সেই টার্ন আর মাছরাঙা আর ঝাউগাছে চড়ুই পাখীর মত সেই পাখীগুলো। অনেক দূর হাঁটবার পর হাঁসের ডাক শুনতে পেলেন। তারপর বিদিয়াকে দেখতে পেলেন। আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিদিয়া গাছ-কোমর ক'রে কাপড় পরেছে, বন্দুকটা পিঠের উপর বেঁধেছে, সাপের মত বুকে হেঁটে একটা বালির টিলার উপর উঠছে। টিলার উপর উঠে সন্তর্পণে সে মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে চাইলে। নীচেই গঙ্গা। মেয়েটার সাহস আছে বলতে হবে। ওই অপল্‌কা বালির টিলা যদি ধ'সে পড়ে তা হ'লেই মৃত্যু, অত উঁচু থেকে একেবারে জলে পড়বে।

ভুবন সোম রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলেন। কিছু হ'ল না। টিলা থেকে নেবে এল বিদিয়া। হেঁটে নাবল না, বন্দুকটা পিঠ থেকে খুলে নিয়ে দু হাতে ধ'রে ঢালু টিলা বেয়ে সর সর ক'রে নেবে এল। শহরের পার্কে ছেলেমেয়েরা যেমন 'সি প' খায় অনেকটা তেমনই ক'রে। টিলার নীচে নেবে এদিক ওদিক চাইতে লাগল সে। তারপর দেখতে পেলে ভুবন সোমকে। ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে

ইশারা করলে। ভুবন সোম চলতে লাগলেন। হাঁসের ডাক তিনি আগেই শুনতে পেয়েছিলেন, কাছাকাছি আসাতে আরও স্পষ্ট শুনতে পেলেন। তারপর দেখতে পেলেন। তাদের খুব কাছ দিয়ে যেতে লাগলেন, তবু তারা পালাল না। বিদিয়া কুঁজো হয়ে হেঁটে দেখিয়ে দিলে—কুঁজো হয়ে হাঁটুন। কুঁজো হয়েই হাঁটতে লাগলেন ভুবন সোম। বিদিয়ার কাছাকাছি আসতেই বিদিয়া বন্দুকটা তাঁর হাতে দিয়ে ফিসফিস ক'রে বললে, 'অনেক বড় বড় হাঁস আছে। ঠিক টিলাটার নীচেই বেশী আছে। আপনি টিলাটার উপরে গিয়ে শুয়ে মারুন ওপর থেকে। ঠিক নীচেই আছে হাঁসগুলো। দিন, বন্দুকটা আমি ধরছি। আপনি বুকে ভর দিয়ে ওপরে উঠুন আগে, তারপর আপনাকে বন্দুকটা দেব।'

ভুবন সোম তাই করলেন। বিদিয়া যেমন ক'রে টিলার উপর উঠেছিল তিনিও তেমনিভাবে উঠতে লাগলেন। বিদিয়াও বন্দুকটা নিয়ে তাঁর পিছু পিছু ঠিক তেমনিভাবে উঠতে লাগল। টিলায় উঠে তিনিও সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখলেন, অনেক হাঁস রয়েছে—গীজ, টিল অনেক। পঞ্চাশ গজের মধ্যেই।

বিদিয়া বন্দুকটা এগিয়ে দিলে আস্তে আস্তে।

অনেকক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য ক'রে দড়াম্ দড়াম্ ক'রে দুবার ফায়ার করলেন তিনি। চিৎকার ক'রে হাঁসগুলো উড়ল। বিদিয়া ছুটে নীচে নেবে গেল।

তিনিও গেলেন। একটাও পড়ে নি।

॥ ছয় ॥

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। গঙ্গার চরে একা ব'সে আছেন ভুবন সোম। অদ্ভুত চেহারা হয়েছে তাঁর। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ময়লা কাপড়, মাথায় ময়লা পাগড়ি। বুকে পিঠে গোঁফে ভুরুতে মাথায় বালি লেগেছে প্রচুর। বিদিয়া ঝাউগাছের ডাল কেটে আনতে গেছে। আশ্বাস দিয়ে গেছে, ঝাউগাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে এইখানেই আবার হাঁস পাবেন তিনি। ঠিক পাবেন। সেই আশায় ব'সে আছেন ভুবন সোম। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে কে যেন বলছে, ওর কথা মিথ্যে হবে না। হাঁসেরা ঠিক ঘুরে আসবে আবার। আর একটা কথাও তিনি অবাক হয়ে ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎ কেঁদে ফেললেন কেন! তিনি জীবনে কখনও কাঁদেন নি, মা বাবা স্ত্রী টগর—কারও মৃত্যুতে তিনি কাঁদেন নি। ঋণের দায়ে বাড়িটা যখন বিষুণদাস মারোয়াড়ী নিয়ে নিলে, তাদের পথে দাঁড়াতে হ'ল, তখনও এক ফোঁটা জল তাঁর চোখ দিয়ে বেরোয় নি। কিন্তু, আজ এ কি হ'ল! হাঁস মারতে পারেন নি তো কি হয়েছে! বুড়ো হয়েছেন, হাত কেঁপে যাচ্ছে, এতে কাঁদবার কি আছে? এই-ই তো স্বাভাবিক। ছি-ছি, ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন মেয়েটার সামনে! যদিও ওকে বললেন যে, চোখে বালি পড়েছে ব'লে জল বেরুচ্ছে; কিন্তু ওর মুখ দেখে উনি তখনই বুঝলেন যে, মিথ্যে কথায় ও ভোলে নি। ও ঠিক বুঝতে পেরেছে, কোন কথা বলে নি কিন্তু। অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে ছিল কেবল তাঁর মুখের দিকে। অতবড় মুখরা মেয়ে, একটি কথা বলে নি তারপর থেকে। যাবার আগে কেবল ব'লে গেল, 'আপনি

বসুন এখানে, আমি ঝাউডাল নিয়ে আসি। হাঁসেরা আবার এখুনি আসবে। এবার ঠিক মারতে পারবেন।'

মারতেই হবে। হাঁস না নিয়ে তিনি যাবেন না এখান থেকে। সমস্ত রাত যদি এই চরে ব'সে থাকতে হয়, তাও থাকবেন।

চরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, তাঁর জীবনও ঠিক এই চরের মত। খাঁ-খাঁ করছে। কেউ নেই, কিছু নেই। গঙ্গার চরে তবু পাখী আসে, নৌকো ভেড়ে, চাষীরা কাজ করে, বিদিয়ারা ঘর বাঁধে; তাঁর জীবনের চরে ধূ-ধূ বালি কেবল। চর নয়—মরুভূমি, তাতে মরীচিকাও নেই, ওয়েশিসও নেই। 'নেভার মাইণ্ড, বেটার লাক্ নেক্স্ট (next) টাইম, মানে পরজন্মে। পরজন্মে আর যেন এ দেশে না জন্মাতে হয়।'—ব'লেই থেমে গেলেন তিনি। মনে হ'ল, না, এ দেশের দোষ কি! আজ সকাল থেকে যতগুলো লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল—ভুট্টা, ভাগিয়া, ভিখন, চতুর্ভুজ, বিদিয়া—এরা কি খারাপ লোক? অন্য দেশে কি এদের চেয়ে ভাল লোক আছে? না, দেশের দোষ নয়, দোষ তাঁর কপালের।···

এক বোঝা ঝাউয়ের ডাল টানতে টানতে বিদিয়া এসে হাজির হ'ল। দড়িও এনেছে খানিকটা। হাঁপাচ্ছে।

'আসুন, তাড়াতাড়ি বেঁধে দিই। ওই দিকে দেখলাম, দুটো চখা উড়ছে। এখনও বসে নি। কিন্তু এইখানেই বসবে কোথাও। আসুন—'

ভুবন সোমের পেটে পিঠে মাথায় সে ঝাউয়ের ডালগুলো বাঁধতে লাগল।

'সামনের ওই ডালগুলোর ভিতর বন্দুকটা আড়াল ক'রে রাখুন। টোটা পুরেছেন?'

'পুরেছি।'

'এইখানেই বসবে চখা দুটো। আপনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকুন। একটুও নড়বেন না যেন, আমি ওই অড়রক্ষেতে বসছি গিয়ে।'

সর্বাঙ্গে ঝাউডাল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন ভুবন সোম। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট কাটাল। হাতঘড়িটা হাতেই বাঁধা ছিল তাঁর, মাঝে মাঝে আড়চোখে সেটার দিকে চেয়ে দেখছিলেন। আরও পাঁচ মিনিট কাটল। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ঠিক আসবে, বিদিয়া যখন বলছে তখন ঠিক আসবে।

'কাঁ-আ—'

ওই আসছে। সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ ব'য়ে গেল তাঁর। কিন্তু একবার ডেকেই থেমে গেল কেন? আর তো ডাকছে না? কোথা গেল? ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সাহস হ'ল না, বিদিয়া মানা করেছে। অড়রক্ষেতে ব'সে সে তাঁর প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করছে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

কটা? অনেকগুলো মনে হচ্ছে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

ঠিক তাঁর সামনে এসে বসল এক জোড়া চখা। খুব কাছে। একটু স্থির হয়ে বসুক, এখুনি ফায়ার করব না, ভাবলেন ভুবন

সোম। মিনিট খানেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ফায়ার করলেন।

দুটোই উড়ে গেল।

বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবন সোম।

'পড়েছে, পড়েছে, একটা পড়েছে—'

চিৎকার ক'রে বিদ্যুৎবেগে ছুটল বিদিয়া।

পড়েছে? কোথায়? তিনি তো দেখলেন, দুটোই উড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ঝাউয়ের ডালগুলো খুলে ফেললেন তিনি। চারদিকে চেয়ে বিদিয়াকে দেখতে পেলেন না। কোথা গেল ছুটে? তারপর দেখতে পেলেন, একটা জ্যান্ত চখা নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

'এই নিন। পায়ে খুব সামান্য লেগেছে। ভয়েই প'ড়ে গিয়েছিল। জ্যান্তই নিয়ে যান। ভালই হয়েছে, মরে নি। আপনার বাজি জেতাও হ'ল, এটাও ম'ল না। ইচ্ছে করলে একে পুষতেও পারেন। পোষ মানবে কি?'

ভুবন সোমের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

মজুরগুলো ছুটে এল মাঠ থেকে। দড়ি দিয়ে চখার পা দুটো আর ডানা দুটো বেশ ভাল ক'রে বেঁধে দিলে তারা। হাত ফসকে আর পালাতে পারবে না। হাতে ঝুলিয়ে নেবার জন্য আর একটা ফাঁসও ক'রে দিলে। চমৎকার বড় চখাটা। গলার কালো কণ্ঠিটা দেখিয়ে একজন বললে, এটা নর, অর্থাৎ পুরুষ চখা।

চখাটা হাতে ঝুলিয়ে চতুর্ভুজ গোপের আস্তানায় এলেন ভুবন সোম।

বিদিয়াও পিছু পিছু এল।

'এখুনি চ'লে যাবেন ?'

'হ্যাঁ, এখুনি যেতে হবে, প্রায় দুটো বাজে।'

'আর কিছু খাবেন না ?'

'না।'

মক্‌খুর কাপড়গুলো ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের জামা-কাপড় পরলেন ভুবন সোম। সর্বাঙ্গে বালি কিচকিচ করছে। তারপর একটু ইতস্তত ক'রে মনিব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার নোটটা বার করলেন—সেই নোটটা, যেটা ভাগিয়া কুড়িয়ে দিয়েছিল।

'এই নাও, তোমরা মিষ্টি খেও—'

'আপনার কাছ থেকে টাকা নেব ? কি বলছেন আপনি !'

'তোমাদের জনমজুরদের বকশিশ দিও।'

'না, কাউকে কিচ্ছু দিতে হবে না। অতিথির কাছ থেকে আমরা পয়সা নিই না।'

এর পর আর কি বলবেন ভুবন সোম ! একটু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করলেন, তারপর বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তা হ'লে চলি। হ্যাঁ, এই সিগার কটা ওই মজুরদের দিয়ে দিও, ওরা চাইছিল। আচ্ছা, চললুম তা হ'লে।'

চখাটাও হাতে ঝুলিয়ে নিলেন।

'আসুন।'

হঠাৎ হেঁট হয়ে বিদিয়া প্রণাম করল তাঁকে।

'আবার আসবেন।'

'আচ্ছা।'

ভুবন সোম এগিয়ে গেলেন কিছু দূর।

'শুনুন—'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, বিদিয়া ছুটে আসছে।

'সোম সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয় ওঁর জন্যে বলবেন একটু। চাকরিটা যেন না যায়—'

'আচ্ছা, বলব। কিন্তু ঘুষ নেওয়া যদি প্রমাণ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে সোম সাহেব কিছু করতে পারবেন না। তাঁকেও তো চাকরি করতে হয়—'

'তবু বলবেন একটু।'

বিদিয়া চ'লে গেল।

ভুবন সোম হাঁটছিলেন। কাঁধে বন্দুক, আর হাতে চখাটা। কোথায় যাচ্ছেন খেয়াল ছিল না তাঁর। গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে সোজা চলেছিলেন। ক্লান্ত হয়েছিলেন খুব, কিন্তু সে দিকেও আর খেয়াল ছিল না। যন্ত্রচালিতবৎ হাঁটছিলেন।

'কাঁ-আ—'

চমকে উঠলেন তিনি। এইটেই ডাকল না কি!

'কাঁ-আ—'

এইবার দেখতে পেলেন, আর একটা চখা তাঁর মাথার উপর উড়ছে। এরই সঙ্গীটা নাকি!

আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলেন।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

সমানে মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

'এটাকেও শেষ ক'রে দেওয়া যাক।'

বাঁধা-চখাটা মাটিতে নাবিয়ে রেখে বন্দুকে টোটা পুরলেন। ঠিক মাথার উপরে উড়ছে, একটু যেন নেমে এল। ফায়ার করলেন। লাগল না। চখাটা চক্রাকারে উড়তে লাগল। খানিকক্ষণ সেটার

দিকে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন। পালাচ্ছে না তো! আবার ফায়ার করলেন। এবারও লাগল না।

'মরুক গে—'

চখাটা তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে আবার শুনতে পেলেন—'কাঁ-আ' 'কাঁ-আ।' হাতের চখাটা ছটফট করতে লাগল। ভুবন সোম দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রায় দৌড়তে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে হাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। বসলেন এক জায়গায়।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

সমানে উড়ে আসছে চখাটা সঙ্গে সঙ্গে। তিনি বসতে তাঁর মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। ভুবন সোম পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, আরও গোটা দুই টোটা আছে। কিন্তু আর ফায়ার করতে ইচ্ছে হ'ল না তাঁর। কিন্তু চখাটা কাঁ-আ কাঁ-আ শব্দ ক'রে ক্রমাগত চক্রাকারে উড়তে লাগল মাথার উপর। একটু দূরে ভিখন গোপের নৌকোটা বাঁধা আছে দেখলেন। কিন্তু কাছে-পিঠে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। মহেন্দর সিংয়ের ডোটায় আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হ'ল না। ভাবলেন, সোজা হাঁটতে হাঁটতে ঘাটেই চ'লে যাই।

আবার উঠে হাঁটতে লাগলেন।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

চখাটা ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কি মুশকিল! বাড়ি পর্যন্ত যাবে নাকি! উপরের দিকে না চেয়েই তিনি চলতে লাগলেন। বেশ জোরে জোরে চলতে লাগলেন আবার। চখাটা কিন্তু নাছোড়-বান্দা, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

'কাঁ-আ, কাঁ-আ—'

এইভাবে আধ ঘণ্টাটাক কাটল। তারপর আশ্চর্য ঘটনা ঘটল একটা। তিনি কবি নন, তবু তাঁর মনে একটা আজগুবি রূপক মূর্ত হতে লাগল ক্রমশ। তাঁর মনে হতে লাগল, যে পুরুষ-চখাটাকে তিনি জখম ক'রে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন সে যেন সখীচাঁদ, আর যেটা উড়ে উড়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসছে সে বিদিয়া। 'কাঁ-আ, কাঁ-আ, কাঁ-আ' এই ডাকের মধ্যে তিনি শুনছিলেন, 'দয়া করুন, ওকে ছেড়ে দিন। ওর চাকরিটা যেন না যায়, তা হ'লে আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না।'

বন্দী পাখীটা ছটফট করছে তাঁর কবলে।

...সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে। বালির চর ভেঙে হেঁটে চলেছেন ভুবন সোম। মাথার উপর করুণকণ্ঠে ডাকতে ডাকতে উড়ে চলেছে চখীটা। দৃঢ়মুষ্টিতে ধ'রে আছেন তিনি চখাটাকে। কিছুদূর গিয়ে একটা সবুজ ক্ষেত চোখে পড়ল। চোখ জুড়িয়ে গেল যেন। মুগ্ধনেত্রে সেটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে কে যেন! ক্ষেতের মাঝখানে একটা লোক ঘাস কাটছিল। সেই দিকে এগিয়ে গেলেন ভুবন সোম। লোকটাকে ডাকতেই এগিয়ে এল সে।

'এই চিড়িয়াঠো কো বন্ধন কাট দেও।'

লোকটার হাতে কাস্তে ছিল, পায়ের এবং ডানার বাঁধন অনায়াসে কেটে ফেললে সে। ভুবন সোম ছেড়ে দিলেন পাখীটাকে। নিমেষের মধ্যে সঙ্গিনীর কাছে ফিরে গেল সে। তারপর এক-সঙ্গে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

যতক্ষণ দেখা গেল, ভুবন সোম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন।

॥ সাত ॥

সেদিনও সন্ধ্যার স্টীমারটা খুব 'লেট' আসছিল।

সখীচাঁদ যাদব নিজের কোয়ার্টারে ব'সে 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ছিল তন্ময় হয়ে। সে ঠিক করতে পারছিল না, বৈদেহীর সঙ্গে কার বেশী মিল—তিলোত্তমার, না, আয়েষার! হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে পয়েণ্টস্‌ম্যান বাসদেওয়ের কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে উঠল।

'সখীচাঁদবাবু, সাহেব আয়ে হেঁ।'

সাহেব! সাহেব কে এল আবার! লণ্ঠনটি নিয়ে বেরিয়ে দেখে—ও বাবা, স্বয়ং ভুবন সোম!

ভুবন সোম বাসদেওয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'আব তুম যাও।'

বাসদেও চ'লে গেল।

ভুবন সোম সখীচাঁদকে অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন একটা।

'তুলসীগাছ আছে তোমার বাড়িতে?'

'তুলসীগাছ! আজ্ঞে না।'

'কয়েকটা তুলসীপাতা চাই।'

'বোসবাবুর বাড়িতে আছে। আনব?'

'আন।'

সখীচাঁদ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ভুবন সোম চেয়ারে ব'সে ব'সে পা দোলাতে লাগলেন। মিনিট দশেক পরে সখীচাঁদ ফিরল এক মুঠো তুলসীপাতা নিয়ে।

'কাগজে মুড়ে দেব?'

'না। তোমার ওই কলসীতে কিসের জল?'

'গঙ্গাজল, সার্‌।'

'একটা বাটিতে ঢাল।'

সথীচাঁদ উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার সাহস ছিল না তার। একটা বাটিতে গঙ্গাজল ঢাললে সে খানিকটা।

'তুলসীপাতাগুলো ওর মধ্যে ফেলে দাও। আর এই পয়সাটাও দাও।'

মনিব্যাগ থেকে একটি পয়সা বার ক'রে দিলেন তাকে।

'এইবার তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে দিব্যি কর যে, আর কখনও ঘুষ নেবে না। হাঁ ক'রে দেখছ কি? ওইগুলো হাতে নিয়ে তিনবার জোরে জোরে বল—আর আমি কখনও ঘুষ নেব না। জোরে জোরে বল।'

সথীচাঁদকে বলতে হ'ল।

'এবার তোমাকে ছেড়ে দিলুম'। ভবিষ্যতে এই প্রতিজ্ঞার কথা যেন মনে থাকে। আর এক কাজ ক'রো। অনিলকে খবর দিয়ে দিও যে, এই ষ্টীমারেই আমি চ'লে যাচ্ছি। আজ রাত্রেই খবরটা দিতে পারবে?'

'আমিই না হয় চ'লে যাব সার্, ডিউটি ওভার হ'লে।'

'তাকে ব'লে দিও যে, আমি একটা চখা পেয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, সার্।'

ভুবন সোম উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সথীচাঁদ লণ্ঠনটা নিয়ে এগিয়ে আসতেই বললেন, 'না, আলো দেখাতে হবে না।'

গটগট ক'রে এগিয়ে গেলেন জেটির দিকে।

পনর দিন পরে ঝক্সু পিওন শ্রীমতী বৈদেহী যাদবের নামে গোলাপী খামে যে চিঠিটি দিয়ে গেল, তাতে সথীচাঁদ সবিস্তারে যা

যা লিখেছিল তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ছ পাতা চিঠি। এ কাহিনীর পক্ষে যেটুকু প্রাসঙ্গিক সেইটুকু শুধু উদ্ধৃত করছি।

পুনশ্চ দিয়ে সখীচাঁদ লিখেছিল 'দেবী, একটা সুসংবাদ আছে। ভুবন সোম আমার নামে রিপোর্ট করে নি। শুনলাম, সাহেবগঞ্জে আমাকে বদলি করেছে। ওটা খুব ভাল স্টেশন। অনেক উপরি—'

॥ সমাপ্ত ॥